ওহাবী আন্দোলনের রূপরেখা

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ওহাবী আন্দোলনের রুপরেখা

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

পরিবেশনায়

খানকাহে হুসাইনিয়া দারুল ইসলাহ

ইলামবাজার, বীরভূম, (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

ওহাবী আন্দোলন – ১

আরব বিশ্বে ওহাবী আন্দোলন ও নজদের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী

আরবের বিখ্যাত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী একজন ঐতিহাসিক বিতর্কিত ব্যাক্তি । তিনি ১১১৫ হিজরীতে (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ) আরবের উয়াইনা অঞ্চলে বনু তামিম গোত্রের একটি শাখা বনু সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি দুজন শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন । মদীনায় সুলাইমান আল কুর্দী ও মুহাম্মাদ হায়াত আল সিন্ধীর নিকট শিক্ষালাভ করেন । কিন্তু তাঁর দুজন শিক্ষকই ধর্মবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁকে দোষারোপ করেন । তাঁর জীবনের অধীকাংশ সময় দেশ ভ্রমনে অতিবাহিত হয়েছে । জাস্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন, “প্রথমে তিনি চার বছর বসরার কাযী হুসেনের বাটিতে গৃহশিক্ষক ছিলেন । পরে পাঁচ বছর তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানের জনৈকা ধনবতী বিধবাকে শাদী করেন । এ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পথে বের হন এবং এক বছর কুর্দিস্তান ও দু’বছর হামাদানে অবস্থান করার পর ইসপাহানে উপস্থিত হন । তখন নাদির শাহের শাসন শুরু হয়েছে (১১৪৮ হিঃ, ১৭৩৬ খ্রীঃ) । এখানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন এবং এরিস্টটলের দর্শন ও সুফিতত্ত্বে উচ্চজ্ঞান লাভ করেন । এক বছর তিনি সুফি-মতবাদে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন । পরে কুম শহরে গমন করেন এবং হামবলী মযহাবের একজন গোঁড়া সমর্থক হন । শেষে তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রকাশ্যে নিজের মতবাদ প্রচার করতে

থাকেন । 'কিতাব অল-তওহীদে' তাঁর বিষেশ মতামতগুলি বিধৃত আছে । তাঁর অনুগামীদের দল বর্ধিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয় । এমনকি তাঁর সহোদর ভ্রাতা সুলায়মান তাঁকে আক্রমন করে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন । তাঁকে কেন্দ্র করে বিবাদ ও রক্তপাত হওয়ায় স্থানীয় শাসক তাঁকে বহিস্কার করেন । তখন তিনি সপরিবারে দারিয়াপল্লীতে উপস্থিত হন । দারিয়ার আমীর মুহম্মাদ ইবনে সউদ তাঁকে আদরের সংগে গ্রহণ করেন ও তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়ে তাঁর মতবাদ প্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠেন ।" (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৭৬/৭৭)

জাস্টিস আব্দুল মওদুদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "শীঘ্রই আবদুল ওহহাবের প্রচারণা রাজনৈতিক রুপ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ইসলামের প্রথম যুগে রাজ্য-বিস্তৃতির মতোই বিস্ময়কর হয়ে উঠে । ইবনে সউদের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী আরব লিগ গঠিত হয়, এবং দারিয়াকে কেন্দ্র করে সউদী অধীকার বর্ধিত হতে থাকে । 'কিতাব অল তওহীদের' শিক্ষাদানের সংগে আগ্নেয়াস্ত্রের শিক্ষাদানও চলতে থাকে । ফলে রিয়াদের শেখের সংগে ১৭৪৭ সালে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । এ সংঘর্ষ চলে প্রায় আট বছর ধরে এবং ইবনে সউদ ও তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৬৫ খ্রীঃ) তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল আযীয ইঞ্চি ইঞ্চি করে রিয়াদ অধিকার করেন । ১৭৬৬ সালে আবদুল ওহহাব মক্কার শরীফের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নিজের মতবাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন । মক্কার শরীফ আবদুল ওহহাবের মতবাদ ইমাম হামবলের মযহাব অনুযায়ী বিবেচনা করে সেসব শ্রদ্ধার সংগে প্রচারের নির্দেশ দেন । কিন্তু ১৭৭৩ সালে রিয়াদের শাসক দাহহাম আবদুল ওহহাবের তীব্র বিরোধীতা করেন, কিন্তু আবদুল আজীজের নিকট পরাজিত হয়ে পলায়ন

করেন । দলে দলে বেদুইনরা আবদুল ওহহাবের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাঁর শিরেই বিজয়মাল্য শোভিত হয় । উত্তরে কাসিম থেকে দক্ষিণে খরজ পর্যন্ত সমগ্র নেজদ ভূমিতে আবদুল আজীজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে আবদুল ওহহাব ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জান্নাতবাসী হন ।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৭৭)

পরবর্তীকালে আব্দুল আজীজ ও তাঁর পুত্র সউদ বিন আব্দুল আজীজ বীর বিক্রমে অভিযান চালাতে থাকেন । ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় হামলা চালানো হয় এবং ইরাকের বিভিন্ন স্থানে বারংবার অভিযান চালাতে থাকেন । এই নতুন শক্তির অভ্যুত্থানে আতঙ্কিত হয়ে তুর্কী সুলতান বাগদাদের পাশাকে নির্দেশ দেন যে এই নবজাগ্রত শক্তিতে প্রশ্রয় না দিয়ে অচিরেই ধ্বংশ করে দিতে । কিন্তু ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সউদ বিন আব্দুল আজীজ বাগদাদের পাশাকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং এশিয়ার অধিনস্ত সমগ্র তুর্কী অধিগ্রহণ করে নেন । ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে গালিব পাশা মক্কা থেকে বিতাড়িত হন এবং সউদ বিন আব্দুল আজীজ সেখানে তাঁর অনুচরদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন । কিন্তু সউদ বিন আব্দুল আজীজ সাময়িকভাবে সেখান থেকে বহিস্কৃত হন, কিন্তু তিনি ১৮০৪ সালে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে হেজাজে আক্রমণ করেন এবং মদিনা দখল করেন । পরে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ও তারও কিছুদিন পর জেদ্দা সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেন । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সউদ বিন আব্দুল আজীজের বাহিনী ইসলাম ধর্মকে তার বিভিন্ন সুফি মতবাদ ও বিভিন্ন নিত্যনতুন মনগড়া কুপ্রথা আবিস্কারের (বিদআত) হাত থেকে রক্ষা করার আদর্শ নিয়ে কারবালা এলাকায় তাণ্ডব চালায় । এভাবে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র জাজিরাতুল আরব ওহাবীরা সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেয় । এই প্রসঙ্গে জাস্টিস আব্দুল

মওদুদ লিখেছেন, "১৮১১ সালে ওহাবী সাম্রাজ্য উত্তরে আলেপ্পা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর ও ইরাক সীমান্তের পরবর্তী পূর্বে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।" (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৭৮)

সমগ্র ইসলাম জগত সউদ বিন আব্দুল আজীজের বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকে এবং তুর্কীরা ও তাদের ইউরোপীয় বন্ধুরা সহযোগিতা করে । এই আন্দোলন তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক পরিলক্ষিত হয় । চারিদিকে প্রচার করা হয়েছিল, মুসলিম বিশ্বের মূল কেন্দ্র মক্কা ও মদিনা শহর দুটিতে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে । এরা কুরআন-সুন্নত জীবিত করার নাম করে আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলমান যাঁরা তাঁদের মতবাদ মানে না তাঁদের মুশরিক ও কাফের বলতে শুরু করে । এরা তাঁদের হত্যা করে মুসলমানের রক্তে হোলী খেলার আনন্দে মেতে উঠে । ১২২১ হিজরী সনে রোম সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্য লিপ্সায় মত্ত হয়ে এই ওহাবী দল মক্কা ও মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে । সুন্নতের ধ্বজাধারী এই দলটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরীফাইন অর্থাৎ মক্কা ও মদিনা এবং হারামের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমণ এবং তাণ্ডবলীলা চালায় । ওলী-আউলিয়া এমনকি সাহাবায়ে কেরামদের মাযারগুলি পর্যন্ত ধুলিস্যাৎ করে দেয় । মাযহাব মান্যকারী মুসলমান ও আলেম-উলামাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং তাঁদের মাল ও আসবাবপত্র লুঠতরাজ করে নেয় । তাদের মাল ও আসবাবপত্র লুন্ঠন করাকে হালাল বলে ফতোয়া দেয় । এমনকি ওহাবীদের হাত থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রওজা-মুবারকও রেহাই পায়নি । আরবের যেসব মসজিদে কারুকাজ করা ছিল ও যেসব শোভা বর্ধনকারী বহুমূল্য জিনিস ছিল সেগুলিও ওহাবীরা

বিলুপ্ত ও লুণ্ঠন করেছিল । বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম সুলতান, বাদশাহ ও ভক্তবৃন্দরা দীর্ঘ এগারো শতাব্দী ধরে স্বদেশের জন্য ভক্তির নিদর্শনস্বরুপ যেসব বহুমূল্য ও দুস্প্রাব্য উপহার পাঠিয়েছিলেন সেসমস্তও মরুবাসী বেদুইন ওহাবীরা লুণ্ঠিত ও কুক্ষিগত করেছিল ।

W.W. Hunter লিখেছেন, "তুর্কী জাতি তাহাদের পূর্বতন গুণাবলী বর্জিত হইয়া বিলাস ব্যাসনের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ঘৃণ্য প্রবৃত্তি পরায়ন হইয়াছিল । এমন কি তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পবিত্রভূমি মক্কা-মদিনায় আগমন করিত তাহাদেরও অনেকেই নিন্দনীয় আচরন দ্বারা পবিত্রভূমিকে কলুষিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই । একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাহাদের অনেকে চরিত্রহীনা নারীদের সংস্পর্শে আসিত, পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য মক্কাধামে গমনকালেও তাহাদের অনেকে চরিত্রহীনা নারী সঙ্গে রাখিত এবং মাদকদ্রব্য সঙ্গে লইত এবং উহা সেবন করিয়া পবিত্রভূমিকে অপবিত্র রাখিত ।" (The Indian Musalman, অনুবাদ-মাওলানা আহমদ আলী)

তুর্কী জাতির এইসব কুকর্ম দেখেই ওহাবীরা উপরিউক্ত কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছিল । তবে উইলিয়াম হান্টার যেসব তথ্য তুর্কী জাতি সম্পর্কে পরিবেশন করেছেন তাতে ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে । তবে যাই হোক ওহাবীদের কর্মকাণ্ড সমগ্র মুসলিম জগতে দারুনভাবে মহাপাপ হিসেবে গণ্য হতে থাকে । মুসলিম জাহান ওহাবীদের বিরুদ্ধে রোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠে এবং তুর্কীর সুলতান কাবা শরীফ ও মক্কা মদিনা শরীফ ওহাবীদের হাত থেকে রক্ষা করার মানসে ও ওহাবীদের

ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসেন । তাতে সমগ্র মুসলিম জগৎ তুর্কী সুলতানের পক্ষপাত অবলম্বন করেন । এখানে উল্লেখ্য যে, উইলিয়াম হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে তুর্কী জাতি সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা যদি সত্য হত তাহলে সমগ্র মুসলিম জাহান তুর্কী সুলতানের পক্ষপাত অবলম্বন করে "ওহাবীদলনে' এগিয়ে আসতেন না । কেননা, হান্টার সাহেবের থেকে তৎকালীন যুগের মুসলমানরাই তুর্কী জাতি সম্পর্কে বেশী অবগত ছিলেন । যাইহোক মিশরের পাশা মুহাম্মাদ আলী পাশাকে 'ওহাবী' ধ্বংসের দায়িত্ব অর্পন করা হয় । তিনি তাঁর পুত্র তুসুনকে ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত সৈন্য হেজাজ অধিকার করতে পাঠান । ফলে মুহাম্মাদ আলী পাশার পুত্র তুসুন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মদিনা ও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা দখল করেন এবং মুহাম্মাদ আলী পাশা স্বয়ং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশরবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন । ফলে ওহাবী বাহিনীর নেতা সউদ বিন আব্দুল আজীজ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে ইন্তেকাল করেন । সউদ বিন আব্দুল আজীজের পুত্র আব্দুল্লাহ বিন সউদ ততো সাহসী ও বীর ছিলেন না । তিনি অটোমান সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করবেন ও মিশরবাহিনী নজদ ত্যাগ করে চলে যাবে এই শর্তে তুসুনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন । কিন্তু মুহাম্মাদ আলী পাশা এই সন্ধি ভঙ্গ করে ইবরাহীম পাশাকে পুনরায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ যুদ্ধের পর মে মাসে রাজধানী দারিয়ায় উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ওহাবীদের রাজধানী দারিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন । আব্দুল্লাহ বিন সউদকে বন্দী করে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে যাওয়া হয় । জাস্টিস আব্দুল মওদুদের ভাষায় – "আরব মরিচিকার মতোই সহসা চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়ে 'ওহাবীদের' বিশাল সাম্রাজ্য ও ক্ষাত্র শক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল – তার কোনও অস্তিত্বই রইল না ।" (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৭৮) তবে ঐতিহাসিক Philip K. Hitti লিখেছেন, "ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও

ওয়াহাবীদের মতবাদ প্রসার লাভ করতে থাকে । পূর্বে সুমাত্র থেকে পশ্চিমে নাইজেরিয়ে পর্যন্ত এই মতবাদের প্রভাব দেখা যায় ।” (History of the Arabs, Page-834)

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শুরুর দিকে ওহাবীরা পুনরায় নতুন করে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস করে । তাও ছিল খুব স্বল্প সময়ের জন্য । পরবর্তীকালে ওহাবী রাষ্ট্র ও বংশের পুনরুদ্ধারকারী আব্দুল আজীজ বিন সুয়ুদ-এর উত্থান হয় । প্রথম জীবনে তিনি কুয়েতে নির্বাসিত ছিলেন । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হেইলের ইবনে রশীদ পরিবার এবং মক্কার বাদশাহ শরীফ হোসেনের পরিবারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মক্কার বাদশাহ শরীফ হোসেন ব্রিটিশদের সমর্থন পেয়ে নিজেকে ‘আরবের রাজা’ বলে ঘোষনা করেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ‘আমীরুল মোমেনীন’ (মোমীন মুসলমাদের খলিফা) আখ্যা পান । আব্দুল আজীজ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রশীদ পরিবারের অবসান ঘটান এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা দখল করেন ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মদিনা ও হেজাজ দখল করেন । ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুয়ুদ আরবীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন যার অধিশ্বর ছিলেন তিনি নিজেই ।

ওহাবীদের আকিদা ও ধ্যানধারণা

জাস্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন, “আবদুল ওহহাবের ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদের আলোচনায় প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরবদেশে ‘ওহাবী’ নামাংকিত কোনও মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই । এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে এবং মতানুসারীদের

বিদেশী দুশমন, বিশেষত তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা ‘ওহাবী’ কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত । কোনও কোনও ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Neibuhr) আবদুল ওহহাবকে পয়গম্বর বলেছেন । এসব উদ্ভট চিন্তার কোন যুক্তি নেই । প্রকৃতপক্ষে আবদুল ওহহাব কোনও মযহাব সৃষ্টি করেন নি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হামবলের মতানুসারী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর প্রযত্ন ছিল বিশ্বনবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রুপ ছিল, সেই আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা ।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৭৯)

এখানে জাস্টিস আব্দুল মওদুদের বক্তব্যের উপর ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে । একথা অবশ্যই ঠিক যে ‘ওহাবী’ কথাটি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের শত্রু দ্বারা প্রচারিত । কিন্তু “তার প্রযত্ন ছিল বিশ্বনবী ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রুপ ছিল, সেই আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা ।” এ নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মহলে ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আলেম উলামারা একমত নন । যেমন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) ওহাবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লিখেছেন, “মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের নজদ নামক স্থান হতে প্রকাশ হয়েছে । যেহেতু তার বদ আকিদাহ-ভ্রান্ত ধারণা ছিল । এই কারণেই সে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে হত্যাকাণ্ড করেছিল । আহলে সুন্নতকে জোরপূর্বক তাঁর মতাবলম্বী করতে চেয়েছিল । সুন্নীদের সম্পদ জোরপূর্বক নেওয়া হালাল ধারণা করত । ওতের কতল (হত্যা) করা সওয়াবের কাজ মনে করত । আরববাসীকে বিশেষ করে মক্কা ও মদিনাবাসিকে অত্যান্ত নির্যাতন করেছিল । পুর্ব্বর্তী বুযুর্গদের সম্পর্কে অত্যান্ত খারাপ ভাষা প্রয়োগ করেছিল । তাঁর

কঠিন অতাচারে বহু মানুষ পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল । হাজার হাজার মানুষ তাঁর এবং তাঁর সৈনিকদের হাতে শহীদ হয়েছিল । মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্তপিপাসু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন । মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের ধারণা ছিল যে, সমস্ত মুসলমান মুশরিক ও কাফের । তাদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুঠ করে নেওয়া হালাল-জায়েজ এবং ওয়াজীব । - আজও নজদী ও তার অনুসারীদের এই ধারণা রয়েছে যে, নবীগণ যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন হায়াতে ছিলেন মাত্র । ইন্তেকালের পর তাদের অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল সমান । হুজুর (সাঃ) এর রওজা মুবারক জিয়ারত করতে যাওয়া তারা বিদআত, হারাম ইত্যাদি বলে থাকে । জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ মনে করে । এমনকি হুজুরের রওজা জিয়ারত করবার জন্য সফর করা ব্যাভিচারের সমপর্যায় বলে । তারা যদি মসজিদে নববীতে যেত তাহলে আল্লাহর রাসুলের প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করত না । এমনকি রওজা পাকের দিকে তাকিয়ে দোয়া করত না । জিয়ারত সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তারা সেগুলিকে মিথ্যা বলত । তারা হুজুর (সাঃ) এর শাফায়াত অস্বীকার করে থাকে । তারা রাসুলে পাককে নিজেদের ন্যায় ধারণা করে থাকে । আরও বলে থাকে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহর রাসুলের কোন অধিকার নাই । আমাদের প্রতি তাঁর অবদান নেই । তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় নাই । এই কারণে হুজুরের ওসীলা দিয়ে দোওয়া চাওয়া নাজায়েজ বলে থাকে । তারা বলে থাকে যে, আল্লাহর রাসুল অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশী সাহায্যকারী । আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াতে পারি । নবীর দ্বারা এতটুকুও সাহায্য পাই না । তাদের ধারণায় ইলমে মারেফত, আউলিয়া কেরামদের মুরাকাবা ইত্যাদি বিদআত ও গুমরাহী

এবং আউলিয়া কেরামদের কার্যকলাপ শিরক বলে থাকে । চার ইমাম এবং তাদের অনুসরণকারীদের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে থাকে । হুজুর (সাঃ) এর প্রতি বেশী দরুদ সালাম পাঠ করা ভীষন অপছন্দ করে থাকে ।” (আশশিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা-৪২/৬৬)

‘ফতোয়ায়ে শামী’ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) লিখেছেন, “যেমন আমাদের কালে একটা ঘটনা ঘটেছে, আব্দুল ওহাব নজদীর অনুগামীরা নজদ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পবিত্র মক্কা মদিনার হারাম শরিফে আক্রমণ চালায় । তারা মুখে নিজেদেরকে হাম্বলী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাদের বিশ্বাস তারাই শুধু (বিশ্ব মাঝে) মুসলমান, আর যারা তাদের অনুগামী নয় তারা সকলেই মুশরিক । এই বিশ্বাস বশতঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের লোকজনকে ও উলামাদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করত । অতঃপর এমন দিন আসল, আল্লাহ তায়ালা তাদের এই উদ্ধত্য ক্ষমতা চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিলেন । তাদের জনপদ ধ্বংস করে দিলেন । মুসলমান সৈন্যগণ তাদের ধ্বংস করে ১২৩৩ হিজরী সনে পুনরায় জয়লাভ করলেন ।” (ফতোয়ায়ে শামী, বাবুল লোগাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৭)

জাস্টিস আব্দুল মওদুদ তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহা নজদীর শিক্ষাসমূহ তাঁর লেখা ‘কিতাবুত তাওহীদ’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

“(১) আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও ইবাদত বা আরাধনা পাপ এবং যারাই অন্য কারো উপাসনা করে, তারা বধার্হ ।

(২) অধিকাংশ মানুষই তওহীদ বা একেশ্বরবাদী নয়, তারা ওলী বা সন্তদের মাযারে গমন করে ও আশীষ প্রার্থনা করে; তাদের এসব আচার কুরআনে বর্ণিত ‘মক্কার মুশরেকীন’দের অনুরুপ ।

(৩) ইবাদতকালে নবী, ওলী, ফেরেশতাদের নাম গ্রহণ করা ‘শিরক’ বা বহু দেবার্চনার মতোই নিন্দনীয় ।

(৪) আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও মধ্যবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করা শিরক মাত্র ।

(৫) আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও নিকট উৎসর্গ বা মানত করা শিরক মাত্র ।

(৬) কুরআন, হাদীস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যাতিত অন্য জ্ঞানের আশ্রয় করা কুফর বা অবিশ্বাস মাত্র ।

(৭) কদর বা আল্লাহর অমোঘ বিধানে সন্দেহ প্রকাশ বা অবিশ্বাস করা ধর্মদ্রোহীতা (ইলহাদ) ।

(৮) কুরআনের ‘তা’বিল বা উপাদানগত ব্যাখ্যাদান ধর্মবিরুদ্ধতা ।

ইবনে হামবল থেকে আবদুল ওহহাবের বিরুদ্ধ মতামত নিম্নলিখিত বিষয়ে সুস্পষ্টঃ

(১) জামাতে সালাত আদায় অবশ্যকর্তব্য ।

(২) তাকাব সেবন নিশিদ্ধ এবং এরুপ অপরাধে চল্লিশের অনধিক বেত্রদণ্ড যথেষ্ট । দাড়ী কামানো ও গালি দেওয়ার শাস্তি কাযীর ইচ্ছানুযায়ী ।

(৩) অপ্রকাশ্য মুনাফার, যেমন ব্যাবসায়িক মুনাফার উপর যাকাত দিতে হবে । ইমাম হামবল মাত্র প্রকাশ্য আয়ের উপর যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ।

(৪) কেবলমাত্র কলেমার উচ্চারণই মোমেন বা বিশ্বাসী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যাতে তার জবেহ করা জীব হালাল হতে পারে । তার চরিত্র নিখুঁত কিনা, তারও অনুসন্ধান করা উচিত ।

এছাড়াও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারীরা মালার ন্যায় তসবীহ গণনা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন এই আচরণটি বৌদ্ধদের নিকট থেকে নেওয়া । তাঁরা মনে করেন, তসবীহ বদলে আঙ্গুলের গিঁঠে গিঁঠে আল্লাহর নাম গণনা করা উচিৎ । তাঁরা মসজিদে, মাজারে যেসব নক্সার কাজ করা ছিল তা সবকিছুই তুলে ফেলে দেন । তুর্কীরা যেসব মিনার নির্মান করেন তাও ওহাবীরা ধ্বংস করে দেন । তার পরিবর্তে সাধারণ ও অলঙ্কারশূন্য মসজিদ নির্মান করেন । তবে যাইহোক ওহাবী নেতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে তৎকালীন যুগের সমগ্র মুসলিম জাহান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা এর আগে করা হয়েছে ।

নজদী ওহাবী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী

হযরত রাসুলে কারীম (সাঃ) এর একটা ভবিষ্যৎবাণী সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে । ঐ ভবিষ্যৎবাণীটি হুজুর (সাঃ) এর জ্বলন্ত মু’জিজা ছিল । যা ১২০০ বছর পর প্রকাশ পেয়েছিল । হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে, আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন । উপস্থিত লোকেদের কেউ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

আমাদের 'নজদের' জন্যও দোয়া করুন । বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে, আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন । পুনরায় উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের 'নজদের' জন্যও দোয়া করুন । আমার মনে হয় তৃতীয়বার তিনি বললেন, সেখানে তো ভূমিকম্প, ফিৎনা এবং শয়তানের সিং উদিত হবে । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১০৪৭, অনুবাদ-শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ আজীজুল হক সাহেব, হাদীস নং-৬৬১৩)

এই পবিত্র বাণী হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যুর বারো শত (১২০০) বছর পর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয় । যখন আরবের নজদ এলাকায় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর জন্ম হয় । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র ভবিষ্যৎবাণীতে নজদ নামক স্থানের জন্য বলেছিলেন "সেখানে তো ভূমিকম্প, ফিৎনা এবং শয়তানের সিং উদিত হবে" আর এই 'নজদ' এলাকাতেই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১১১৫ হিজরী (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী অলৌকিকভাবে বাস্তবায়িত হয় । আর এই মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী কিভাবে ইসলাম ধর্মের সরলতা ও স্বাধীনতার নাম করে, কুরআন সুন্নত জীবিত করার নাম করে মুসলিম উম্মাহকে ধোকা দিয়ে মক্কা ও মদিনা সহ আরববিশ্বে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল তা এর আগে মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা হুজুর (সাঃ) এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম । হুজুর গণীমতের লাম

বন্টন করছিলেন । এমতাবস্থায় বনু তামিম বংশের 'জুল খুরাই সারাহ' নামক এক ব্যাক্তি এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইনসাফ করে কাজ করুন । হুজুর (সাঃ) বললেন, তোমার সাহস দেখে দুঃখ হচ্ছে । যদি আমি ইনসাফ না করি, তাহলে ইনসাফ কে করবে? যদি আমি ইনসাফ না করতাম, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে । হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি অনুমতি দিন । আমি ওকে কতল করে দেব । হুজুর বললেন, ওকে ছেড়ে দাও । ওর অনেক সঙ্গী রয়েছে । তাদের নামায ও রোযা দেখে তোমাদের নামায ও রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে । তারা কুরআন পাঠ করবে । কুরআন তাদের গলদেশের নিচে নামবে না । তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায় । (বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ)

এই ঘটনাটি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যাক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! খোদাকে ভয় কর । হুজুর বললেন, যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হই, তাহলে খোদার অনুগত কে হবে ? আল্লাহ পাক জগৎবাসীর জন্য আমাকে আমীন করে প্রেরণ করেছেন । কিন্তু তুমি আমাকে আমী বলে স্বীকার কর না । জনৈক সাহাবী তাকে কতল করার অনুমতি চাইলে হুজুর নিষেধ করলেন । যখন সে চলে গেল, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, তার বংশ থেকে একটি জামাআত বের হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে । কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশের নিচে নামবে না । তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায় । তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমাপূজকদের ছেড়ে দেবে । (মিশকাত শরীফ)

উপরিউক্ত হাদীস শরীফে ‘জুল খুরাই সারাহ’ নামক ব্যাক্তি সম্পর্কে হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলেছিল, “ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইনসাফ করে কাজ করুন” সেই লোকটি বনু তামিম বংশের লোক ছিল । যার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উপরিউক্ত হাদীসে বলেছেন, তার বংশ থেকে একটি জামাআত বের হবে এবং সেই দল মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমাপূজকদের ছেড়ে দেবে । আর এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ছিলেন বনু তামিম বংশের মানুষ । যিনি আরববিশ্বে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিরীহ মুসলমান ও আলেম উলামাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলেন । যা এর আগে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে । আরবের বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক আল্লামা জীনি দাহলান লিখেছেন, “সব চাইতে পরিস্কার কথা এই যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী বনি তামিম বংশের মানুষ । এই কারণে খুবই সম্ভব যে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব ‘জুল খুরাই সারাহ’ তামিমির বংশধর । যার সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।” (আদ দুরার, পৃষ্ঠা-৫১)

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা পরিস্কার প্রমাণ হয়ে গেল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী সম্পর্কে । এবং ইচ্ছা করেই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নজদের জন্য দোয়া করেন নি, কেননা তিনি জানতেন যে, সেখান থেকে ভূমিকম্প, ফিৎনা এবং শয়তানের সিং উদিত হবে । আর যে জায়গার জন্য স্বয়ং নবী (সাঃ) দোয়া করেন নি সেই স্থান এবং সেই স্থানে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী যে অভিশপ্ত একথা সহজেই অনুমেয় ।

ওহাবী আন্দোলন – ২

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)

ঐতিহাসিক পটভূমি

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই ইসলামের আওয়াজ ভারত উপমহাদেশে পৌঁছেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই আরব ব্যবসায়ীগণ ভারত উপমহাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত। বিশেষতঃ শ্রীলঙ্কা ও উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকাগুলোর সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এ পথেই সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক নৌবহর যাতায়াত করত। উপমহাদেশে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমেই ইসলাম আসেনি; বরং হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগেই এদেশে মুসলমানদের সামরিক অভিযান শুরু হয়। অতঃপর ৯২ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু জয় করে উমাইয়া খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময়ে উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতের শেষভাগে সুলতান মাহমুদ বারংবার অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিশাল এলাকা দখল করেন। মাহমুদ গজনভীর শাসন কালের পর মুহাম্মদ ঘোরীর শাসন শুরু হয়। মুহাম্মদ ঘোরী বারংবার অভিযান চালিয়ে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা জয় করেন। অতঃপর দাস, খিলজী ও লোদী বংশের শাসনামলে সর্ব ভারতে মুসলিম শাসনের জয়

ডংকা নিনাদিত হয়। পরিশেষে মোঘল শাসনামলে গোটা উপমহাদেশ ইসলামী শাসনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে সম্রাজ আলমগীরের সময়ে সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের দুর্বলতার কারণে মোঘল শাসনের পতন শুরু হয়। এমনকি শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) মোগল সম্রাটদের এই পতনকলের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

তখন চারদিকে বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা চলছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্রই এক নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছিল। চারদিকে জুলুম, শোষণ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ঠিক এমনি এক মুহুর্তে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) এক প্রভাতী সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হলেন। তিনি ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করলেন। রাজনীতিকে ইসলামের সেবক ও ইসলামপন্থীদের শৌর্যের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান করালেন।

নাম ও বংশপঞ্জিঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম শায়েখ কুতুবুদ্দিন আহমত ওরফে মাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী ইবনে শায়েখ আবদুর রহীম ইবনে শায়েখ ওয়াজিহ উদ্দীন ইবনে শায়েখ মুয়াজ্জিম ইবনে শায়েখ মানসুর ইবনে শায়েখ কামালুদ্দিন ছানী ইবনে শায়েখ কাজীম কাসেম ইবনে শায়েখ কাজী বুধা ইবনে শায়েখ আবদুল মালেক ইবনে শায়েখ কুতুবুদ্দীন

ইবনে শায়েখ কামালুদ্দিন (আউয়াল) ইবনে শায়েখ শামসুদ্দীন মুফতী ইবনে শের মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাতাহ ইবনে উমর ইবনে আদিল ইবনে ফারূক ইবনে জার্জিস ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে মাহান ইবনে হুমায়ুন ইবনে কুরায়েশ ইবনে সুলায়মান ইবনে আফফান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব আল কুরায়শী।

শাহ সাহেব (রাঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "তাফহীমাতে এলাহীয়া"র দ্বিতীয় খণ্ডে বলেনঃ আমার মুহতারাম আব্বা (শায়েখ আবদুর রহীম) ছিলেন জাহেরী বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন এক আরিফ বিল্লাহ ওলী। ঘটনাক্রমে তিনি একবার শায়েখ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রাঃ)-এর মাজার জিয়ারত করতে গেলেন। শয়েখ বখতিয়ার কাকী (রাঃ) তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তিনি আব্বাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। সন্তানটি তাঁর ঘরেই জন্ম নেবে। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন ছেলের নাম রাখবে কুতুবুদ্দীন। অতঃপর যখন আমার জন্ম হল, আল্লাহ পাক তাঁকে কুতুবুদ্দিন নাম রাখার ব্যাপারটি ভুলিয়ে দিলেন। ওয়ালিউল্লাহ। পরে অবশ্য কুতুবুদ্দীন নামও রেখেছিলেন। শাহ সাহেব (রঃ) ফারূকী খান্দানের লোখ। তাই ইসলামের শুরু থেকেই তারা ইসলামী শিক্ষা ও রাজনীতির সমন্বয়কারী হিসেবে চলে আসছেন। তাঁদের বংশে বীরত্ব, বদান্যতা, জ্ঞান ও মর্যাদায় খ্যাতিমান বহু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর খান্দানের ভেতর সর্বপ্রথম উপমহাদেশে আগমন করেন শায়েখ শামসুদ্দীন মুফতী। তিনি দিল্লী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র শহরে এসে অবস্থান নেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু দরের আলেম, জাহেদ ও পরহেজগার বুযুর্গ ছিলেন। ইসলামের প্রচার-প্রসার কল্পে তিনি সেখানে একটি

দ্বীনি মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময়ে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁকেই সবাই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ভাবত। ফলে পার্থিব ঝগড়া-বিবাদের কাজী ও দ্বীনি মাসায়েলের মুফতী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর পর থেকে শায়েখ মাহমুদ ইবনে কাওয়ামুদ্দীন পর্যন্ত কাজীর দায়িত্বভার তাঁদের হাতেই ছিল। তবে শায়খ মাহমুদ তা পরিত্যাগ করে সেনা বিভাগে যোগ দেন। শাহ সাহেব (রঃ)-এর দাদা পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষজরা জেহাদের ময়দানেই দ্বীনের শান-শওকত বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকেন। কাফের-মোশরেকের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত থাকাকেই তাঁরা পেশা করে নিয়েছিলেন। তাঁর দাদা শায়েখ ওয়াজিহুদ্দীন আজীবন রণাঙ্গণে কাটিয়েছেন। এমনকি মোগল সম্রাট মহিউদ্দীন মুহাম্মদ আলমগীরের সময়ে তিনি জেহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন। শায়েখ ওয়াজিহুদ্দীনের তিন ছেলে ছিল, তারা হলেন শায়েখ আবু রেজা মুহাম্মদ, শায়েক আব্দুল হাকীম ও শায়েখ আবদুর রহীম। শাহসাহেবের পিতা শায়েখ আবদুল হাকীম ও শায়েখ আবদুর রহীম। শাহ সাহেবের পিতা শায়েখ আবদুর রহীম ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন শরীফ, নাহু, সরফ ও অন্যান্য প্রারম্ভিক শিক্ষার কিতাবাদি তার বড় ভাই শায়েখ আবু রেজা মুহাম্মদের কাছে পড়েন। পরবর্তী স্তরে তিনি আল্লামা মীর মোহাম্মদ জাহেদের কাছে জ্ঞানার্জন করেন। এমনকি কিতাবী ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে তিনি এরূপ পারদর্শী হলেন যে, তিনি অনতিকালের ভেতর এ উভয়বিধ জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। সম্রাট- আলমগীর জিন্দাপীরের উদ্যোগে প্রণীত “ফতোয়ায়ে আলমগীরী” কিতাবের তিনি সম্পাদনতা ও শুদ্ধিকরণের দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ আলমগীর তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। শরীয়ী মাজহাদের দিক থেকে তিনি হানাফী ছিলেন।

তাসাওফের ক্ষেত্রে তিনি নকশবন্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। অবশ্য দলীলের শক্তি ও প্রাধান্যের কারণে কখনও হানাফী মজহাবের বাইরেও ফতোয়া দিতেন। ১১৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জন্ম

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) ১১১৪ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল বুধবার দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। এবং মৃত্যু হয় ১১৭৬ হিজরীতে । শায়েখ আবদুর রহীম (রঃ)-এর জীবনচরিত "বাওয়ারিফুল মারিফাত" গ্রন্থে শাহওয়ালিউল্লাহ (রঃ)- এর জন্মকাল ও তার প্রাক্কালের এমনসব ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সম্রাট আলমগীর বা ঐরঙ্গজেবের মৃত্যুর তারিখ হলো ১১১৮ হিজরী ২৮ জিলকদ শুক্রবার । এই হিসাব অনুযায়ী সম্রাট ঐরঙ্গজেবের মৃত্যুর চার বছর আগে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ইন্তেকাল করেন দিল্লীর অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে । এই হিসাবে শাহ সাহেব ১০ জন মুঘল সম্রাটের শাসনকাল এবং তাঁদের উত্থান পতনের ইতিহাস সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন । সেই ১০ জন শাসক ছিলেন যথাক্রমে, (১) সম্রাট ঐরঙ্গজেব, (২) প্রথম বাহাদুর শাহ, (৩) ময়েনউদ্দীন জাহাঁদার শাহ, (৪) ফারুখ শিয়ার, (৫) রফিউদ দারাজাত, (৬) রফিউদ দওলাহ, (৭) মুহাম্মাদ শাহ (৮) মাহমুদ শাহ, (৯) দ্বিতীয় আলমগীর এবং (১০) অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ।

শিক্ষা জীবন

পাঁচ বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষার জন্যে তাঁকে মকতবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর হতেই তিনি কুরআনের হাফেজ হলেন। সে বছরেই তাঁর আব্বা তাঁকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানও যথাযথভাবে আমল করার জন্যে উপদেশ দেন। সাত বছর বয়স থেকেই তিনি ফার্সী কিতাব অনায়াসে পড়ার যোগ্যতা হাসিল করেন। এক বছরে ফার্সী শেষ করে নাহু, সরফ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়া শুরু করেন। দশ বছর বয়সে তিনি শরহে মোল্লা জামী আয়ত্ত করেন। মোটকথা মাত্র তিন বছরে তিনি নাহু-সরফে এরূপ পারদর্শী হলেন যে, উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পর্যন্ত তাঁর সামনে এসে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। তিনি লোগাত, তফসীর, হাদীস, ফিকাহ, তাসাওফ, আকায়েদ, মানতেক, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, অংক শাস্ত্র, জ্যোতি বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি এসব কেতাব শেষ করেন। পুথিগত ও জ্ঞানগত সকল বিদ্যা শেষ করে তিনি তাঁর আব্বার হাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্যে বাইয়াত নেন। অতঃপর তিনি নকশবন্দীয়া তরীকার সুফীদের বিভিন্ন স্তর আয়ত্ত করেন। তিনি আধ্যাত্ম চর্চার ক্ষেত্রেও এরূপ দক্ষতা অর্জন করলেন যে, অল্পসময়ের ভেতরে তিনি সে জগতেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। সলুক সম্পর্কিত তালীম শেষ হলে তাঁর আব্বা শায়েখ আবদুর রহীম তাঁর মাথায় মর্যাদার পাগড়ী বেঁধে দেন এবং তাঁকে শিক্ষা দান করার অনুমতি প্রদান করেন। এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। তাতে দিল্লীর ওলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন, কাজীবৃন্দ ও অন্যান্য আমীর- উমারা উপস্থিত হন। সকলের উপস্থিতিতে শায়েখ আবদুর রহীম তাঁর ভাগ্যবান মহা মর্যাদাবান পুত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহকে জাহের ও বাতেনী দ্বীনী ইলম শিক্ষা দানের অনুমতি দান করেন। পরন্তু তিনি নিজ পুত্রের ইলম ও হায়াত দারাজীর জন্যে দোয়া করেন। গোটা মজলিস আমীন,

আমীন বলে দোয়ায় শরীক হন এবং এক যোগে তাকে মোবারকবাদ জানান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) তাঁর আব্বা ও শায়েখ মুহাম্মদ আফজল শিয়ালকুটির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিবাহ

শাহ সাহেব (রঃ)-এর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখনই তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে করাবার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও সংসারের অন্য সবাই বিয়ের প্রস্তুতি নেই বলে ওজর পেশ করেন, তথাপি তাঁর পিতা সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি বরং অতি ক্ষিপ্রতার সাথে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য উদগ্রীব হলেন। তিনি লিখে পাঠালেনঃ কেন আমি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছি তা তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে। এ চিঠি পেয়ে সবাই রাজী হয়ে গেলেন এবং বিয়ে সম্পন্ন হল। বিয়ের পর পরই তাঁর কজন নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেন। কদিন না যেতেই শায়েখ আবু রেজার ছেলে আবদুর রশীদ মারা যান। তার কিছুদিন পর শাহ সাহেবের মাতা ইন্তেকাল করেন। তারপর স্বয়ং তাঁর আব্বা শায়েখ আবদুর রহীমও ইন্তেকাল করেন। এটাই ছিল শাহ সাহেবের বিবাহের ব্যাপারে তার পিতার তাড়াহুড়ার মূল রহস্য। পর পর এতগুলো আঘাত স্বভাবতঃই তার ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তথাপি তিনি তাঁর জাহেরী ও বাতেনী ইলমের জোরে এসব বিপদাপদ সহজেই কাটিয়ে উঠেন।

হারামাইনের সফর

১১৩১ হিজরীতে তার আব্বার ইন্তিকালের পর তিনি রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর একযুগ শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি আরব-আজমের সর্বত্র স্বীয়

শিক্ষাগত যোগ্যতার বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। চারদিক থেকে ছাত্ররা ছুটে আসছিল তাঁর কাছে জ্ঞানার্জনের জন্যে। তারা নজাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। বার বছর শিক্ষকতার পর তিনি হজ্জের নিয়তে হারামাইন শরীফাইনে যাবার উদ্যোগ নেন এবং ১১৪৩ হিজরীতে তিনি হেজাজে তশরীফ নেন। অতঃপর ১১৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় দু'বছর তিনি মক্কা ও মদীনায় কাটান। সেখানকার ওলামায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। সেখানকার হাদীসবেত্তাদের থেকে তিনি হাদীসের সনদ নেন। বিশেষতঃ শায়েখ ওবায়দুল্লাহ ইবনে শায়েখ মোহাম্মদ ইবনে সুলায়মান আল-মাগরেবীর কাছ থেকে তিনি বিশেষভাবে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেণ। তাছাড়া সেকালের হারামাইনের সেরা আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দেস শায়েখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাদানী থেকেও তিনি হাদীসের সনদ নেন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেনঃ "আমি হারামাইন শরীফাইনের অধিকাংশ বুযুর্গের সাথে দেখা করেছি। সেখানকার অধিকাংশ সর্বজ্ঞাতা পারদর্শী সম্মানিত লোকদের সাথে মেলামেশা করেছি। কিন্তু তাদের কাউকেই সর্বজ্ঞাতা পারদর্শী হয়েও উত্তম চরিত্রে বিমণ্ডিত রূপে দেখতে পাইনি। শুধুমাত্র শায়েখ আবু তাহের আল-মাদানীকে আমি সেরূপ পেয়েছি। তাঁর দূরদর্শিতা ও অগাধপাণ্ডিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি আমার গ্রন্থরাজির বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ করেছি"। শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর সান্নিধ্যে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে হাদীসের বর্ণনা শুনেছেন। মোটকথা শায়েখ আবু তাহের আল-মাদানী তাঁকে শুধু সনদ দেননি, তাঁর নিজস্ব খিরকাও শাহ সাহেবকে দান করেন। সে খিরকা জাহেরী ও বাতেরনী সকল প্রকার ইলম ও ফায়েজের আধার ছিল। হারামইনে থাকা কালে তিনি শায়েখ তাজুদ্দীন হানাফীর

খেদমতেও হাজির হন। তাঁর কাছ থেকেও তিনি সনদ হাসিল করেন। তাছাড়াও তিনি সেখান থেকে শায়েখ আহমদ থানাভী, শায়েখ আহমদ কাশানী, সাইয়েদ আবদুর রহমান ইদরিসী, শায়েখ শামসুদ্দীন মোহাম্মদ, শায়েখ ঈসা জাযরী, শায়েখ হাসান আজমী, শায়েখ আহমদ আলী, শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ প্রমুখ থেকেও সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে সনদ হাসিল করেন। শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে সালেম আল বাসরী ওয়াল মক্কী সবচেয়ে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দেস ও আলিম ছিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন

হারামইন শরীফাইনের বুযুর্গ ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জাহেরী ও বাতেনী ইলমে ভরপুর হয়ে শাহ সাহেব উপমহাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৪৫ হিজরীর ১৪ই রজব তিনি দিল্লী পৌঁছেন এবং নিজ পৈত্রিক আলয়ে অবস্থান করেন। কিছুদিন তিনি বিশ্রাম নেন। এ ফাঁকে দিল্লীর ওলামা-মাশায়েখদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তারপর রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শত শত হাদীস শিক্ষার্থী সেখানে ছুটে এসে তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করে চললেন। আশে- পাশের রাজ্যগুলোয়ও অনতিকালের ভেতর হাদীস চর্চা ছড়িয়ে পড়ল। শাহ সাহেবের যুগে মুসলমান হাদীস সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তারা ফিকাহ শাস্ত্রকেই ইলমের জন্যে যথেষ্ট ভাবত। শাহ সাহেবই হাদীসের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। তিনি লোকদের কোরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়ন এবং এ দুটোকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়ার ও সব মতভেদের বিষয়গুলোর মীমাংসা কোরআন ও হাদীস থেকে আহরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি এ ক্ষেত্রে তিনি আশাতীত সাফল্যও লাভ করেন।

মছলক

শাহ সাহেব ব্যাক্তিগত জীবনে কট্টরপন্থী হানাফী ছিলেন । তিনি লিখেছেন, “হুযুর (সাঃ) আমাকে (কাশফের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রচলিত হানাফী মাযহাব একটি উত্তম পন্থা যা অন্যান্য মাযহাব বা তরিকা থেকে উত্তম, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জামানায় সংগৃহীত ও লিখিত হাদীসগুলির সঙ্গে অতিশয় সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ।” (ফুয়ুযুল হারামাইন, পৃষ্ঠা-৮)

তিনি আরও লিখেছেন, “ভারতবর্ষের সাধারণ (যারা মুজতাহিদে মুতলাক নয়) লোকেদের প্রতি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব অবলম্বন করা ওয়াজীব এবং ঐ মাযহাব ত্যাগ করা হারাম ।” (আল ইনসাফ ফি বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা-৭০)

শাহ সাহেব মনে করতেন প্রায় সমগ্র উম্মতই চারটি প্রণীত মজহাবের সাথে জড়িত হয়ে গেছে। তাই আমাদের যুগে তাদের তাকদীল করা বৈধ হয়ে গেছে। তার ভেতরে কয়েকটি কল্যাণকর দিক রয়েছে আর তা অস্পষ্টও নয়। যে যুগে মানুষের হিম্মত কমে গেছে আর মানুষের অন্তরগুলো বাসনা- কামনায় ভরপুর হয়ে গেছে, সে যুগে এ ছাড়া আর করারই বা কি আছে? মতভেদের বিষয়গুলোয় তিনি বিশুদ্ধ হাদীস অনুসরণ করতেন। দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি হানাফী ও শাফেয়ী মজহাবকে প্রাধান্য দিয়ে পড়াতেন। উপমহাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী যেহেতু হানাফী মজহাবের অনুসারী তাই তিনি সে মজহাবের বিরোধিতা করতেন না।

প্রায় সমগ্র উম্মতই চারটি প্রণীত মজহাবের সাথে জড়িত হয়ে গেছে। তাই আমাদের যুগে তাদের তাকদীল করা বৈধ হয়ে গেছে। তার ভেতরে কয়েকটি কল্যাণকর দিক রয়েছে আর তা অস্পষ্টও নয়। যে যুগে মানুষের হিম্মত কমে গেছে আর মানুষের অন্তরগুলো বাসনা- কামনায় ভরপুর হয়ে গেছে, সে যুগে এ ছাড়া আর করারই বা কি আছে?

ছাত্রবৃন্দ

শাহ সাহেবের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তাদের ভেতরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর চার ছেলে যথাক্রমেঃ শাহ আবদুল আসীফ, শাহ রফিউদ্দীন, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ আবদুল গণী। অন্যান্যরা হলেনঃ শায়েখ মুহাম্মদ আশেক দেহলভী, শায়েখ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী, সাইয়্যেদ মুর্তজা বিলগ্রামী, শায়েখ জাফরুল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম লাহোরী, শায়েখ মুহাম্মদ আবু সাঈদ বেরেলভী, শায়েখ রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী, শায়েখ মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ বিলগ্রামী, শায়েখ মুহাম্মদ মুঈন সিন্ধী, কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী প্রমুখ।

রচনাবলী

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার ভেতরে প্রায় পঞ্চাশখানার খোঁজ পাওয়া গেছে। তিনি তফসীর, হাদীস, তাসাওফ অন্যান্য ইসলামী বিষয়াবলীর ওপর এমন সব গ্রন্থ রচনা করেন যা দেখে জাহেরী বাতেনী ইলমের ধারক ও বাহকগণ তাঁকে এক বাক্যে ইমাম হিসেবে মেনে নেন। তিনি কিছু গ্রন্থ আরবী ভাষায় ও কতিপয় গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। তাঁর যুগে ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা। তাই

দেশব্যাপী এ ভাষায় বহুল প্রচলন ছিল। শাহ সাহেবের প্রণীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১) ফৎহুল রহমান বতরজামাতুল কুরআনঃ এটি হচ্ছে কুরআন পাকের ফার্সী অনুবাদ। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এ অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। তথাপি আজও এর কল্যাণকারিতা ও গুরুত্ব সমানেই অনুভূত হচ্ছে। শাহ সাহেব তাঁর অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

২) আয যুহরাবীন ফি তাফসীরে সূরা বাকরা ওয়া আলে ইমরানঃ এটা সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের ফার্সী বিশ্লেষণ।

৩) আল-ফাউযুল কাবীরঃ তফসীর শাস্ত্রের নীতিমালা সম্পর্কিত এ গ্রন্থখানি শাহ সাহেবের একটি মূল্যবান অবদান। এর মধ্যে তিনি কুরআন পাকের মূল পাঁচটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। এতে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার রীতি- নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মোটকথা শাহ সাহেবের এ ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থটি এ বিষয়ের ওপর রচিত বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। কুরআন হরফের মুকাত্তায়াত ও অন্যান্য সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয় তিনি এতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪) ফতহুল কবীরঃ এতে কুরআনেরক ঠিন ও দুর্লভ শব্দ ও পরিভাষার সহজ ও সুন্দর সমাধান রয়েছে। কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত। কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষার বিশ্লেষণ করেছেন।

৫) আল মুনাওয়া মিন আহাদীসিল মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিকের হাদীস সংকলন "আল মুয়াত্তার" এক বিস্ময়কর আরবী ভাষ্য। শাহ সাহেব ফেকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আর অধ্যায়গুলো সজ্জিত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম মালেকের সেসব মতামত বাদ দিয়েছেন বা অন্যান্য সকল মুজতাহিদের পরিপন্থী। তার বিন্যস্ত প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতের তিনি সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করায় এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। **১৩৫১** হিজরীতে মক্কা শরীফের "আল মাকতাবাতুস সালাফিয়া" থেকেও এটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়।

৬) আল সুসাফফা শরহে মুয়াত্তাঃ এটি মুয়াত্তার ফার্সী ভাষ্য। সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষ্যটি খুবই উপাদেয়। এতে তিনি মুজতাহিদ সুলভ পর্যালোচনা করেছেন। এতে তার ইজতিহাদ ও ইস্তেখরাজের যোগ্যতা প্রামণিত হয়েছে।

৭) আল আরবাঈনঃ শাহ সাহেব এতে চল্লিশটি হাদীসের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। হাদীসগুলো স্বল্প কথায় অথচ ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। হাদীসগুলো তিনি তাঁর শায়েখ আবু তাহের (রঃ)-এর সনদে হজরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

৮) মুসাল সিলাতঃ এটি একটি ক্ষুদ্রকায় আরবী কেতাব। সনদ সম্পর্কিত অতি মূল্যবান তথ্য এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৯) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহঃ (আরবী) ভাষায় রচিত শাহ সাহেবের এ গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ। এতে শরীয়তের বিধি- নিষেধগুলোর গূঢ় রহস্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। পরন্তু এ কালের আধুনিক মন-মানসের শরীয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার চমৎকার জবাব দান

করা হয়েছে। মোটকথা এ গ্রন্থটি একটি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গ্রন্থ। প্রাচীন ও নবীন সবার জন্যেই এটি সমান উপাদেয়।

১০) একদুল জীদ ফি আহকামুল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদঃ ইজতিহাদ ও তাকলীদের ওপর লিখিত একটি বিরল আরবী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শাহ সাহেব ইমাম গণের তাকলীদের পক্ষে লিখেছেন এবং মাযহাব বিরোধীদের দলীলের জবাব দিয়েছেন । খাস করে শাহ সাহেব চরমপন্থী মাযহাব বিরোধী ইবনে হাযম জাহেরীর মতকে খণ্ডন করেছেন ।

১১) আল ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতে ইলমিল ইসনাদঃ এটি আরবী ভাষায় লেখা সনদ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

১২) আল ইনসাফ ফী-বয়ানে সাববিল ইখতিলাফঃ এটি আরবী ভাষায় লেখা একটি উত্তম কিতাব। এতে ফকিহ ও মুহাদ্দেসের মতভেদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া তাকদীল করা বা না করার ব্যাপারেও এতে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। শাহ সাহেব তাঁর আলোচনায় সকল সংকীর্ণতার অবসান ঘটিয়েছেন।

১৩) আল ইন্তিবাহ ফী-সালাসিলে আওলিয়া আল্লাহঃ গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত। পয়লা খণ্ডে খ্যাতনামা আওলিয়ায়ে কেরামের সিলসিলার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে হাদীসের সনদসমূহ ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাবলী। হাদীস ও ফিকাহের ওপর শাহ সাহেব এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১৪) তারাজিমু আবওয়াবিল বুখারীঃ এটি আরবী ভাষায় একটি মূল্যবান গ্রন্থ। হায়দরাবাদে এটি ছাপা হয়।

১৫) ইযালাতিল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফাঃ শাহ সাহেব (রঃ)-এর যুগে রাফেজীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেব তাদের যাবতীয় প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়ে এ গ্রন্থটি লিখেন। এতে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। পরন্তু ইসলামী হুকুমতের তাৎপর্য কি তাও তিনি তাতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এমনকি ইসলামী হুকুমতের রূপরেখাও পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের গুণাবলী ও তাঁদের খেলাফতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং ইসলামী রাজনীতির নীতিমালাগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ কিতাবের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

১৬) কুররাতুল আইনাইন ফী তাফাসিলিশ শায়খাইনঃ এটি একটি ফার্সী গ্রন্থ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক তিনি এতে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে দলীয় প্রমাণ ও মযুক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা দুজন উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাতে হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে রাফেজীদের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন।

১৭) কিতাবুল ওয়াসিয়াতঃ এটি একটি ফার্সী পুস্তিকা। এতে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১৮) রিসালায়ে দানেশমন্দীঃ এটিও একটি কল্যাণপ্রদ ফার্সী পুস্তিকা। এতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে লিখেছেন।

১৯) আল কাওলুল জামীলঃ শাহ সাহেব (রঃ) তাসাওফ তত্ত্বের ওপর সংক্ষেপে অথচ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচনা করেন। তাসাওফের চার তরীকার সিলসিলাগুলো এতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ চার তরীকাই উপমহাদেশে চালু রয়েছে। এতে তিনি তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীম ও অন্যান্য বুযুর্গতের ওজিফা ও দোয়া-দরূদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

২০) সাতাআত,

২১) হামাআত,

২২) লামাহাতঃ

এ তিনটি পুস্তিকাও তাসাওফের ওপর লেখা হয়েছে।

২৩) আলতাফুল কুদসঃ এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত তাসাওফ সংবলিত অত্যন্ত মূল্যবান একটি পুস্তিকা।

২৪) তা'বীলুল আহাদীসঃ এটি আরবী ভাষায় লেখা একটি কল্যাণপ্রদ গ্রন্থ। কুরআন পাকে যে সব আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে, এ গ্রন্থে তাদের ঘটনাবলীর সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত নবুয়তের যে ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা ঘটেছে তার রহস্য ও ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে কিতাবটি স্বভাবতঃই জটিল ও আয়াশলব্ধ।

২৫) আল খায়রুল কাসীরঃ এ কিতাবটিও আরবী ভাষায় রচিত। এটা সৃষ্টি জগতের রহস্য ও কলাকৌশলের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ের ওপর এটা এক অনন্য গ্রন্থ।

২৬) আত তাফহীমাতে এলাহিয়্যাঃ এ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে লিখিত। এর কিছু অংশ আরবী ও ফার্সিতে লেখা হয়েছে। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর মাকালাত ও রিসালাত জমা করা হয়েছে। শরীয়ত ও যুক্তিবুদ্ধির বিভিন্ন সমস্যা এতে আলোচিত হয়েছে এবং ইলহামীপন্থায় তা উপস্থাপন করা হয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী থেকে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২৭) আল বদুরুল বালেগাহঃ তাসাওফ শাস্ত্রের ওপর লেখা শাহ সাহেবের এ গ্রন্থখানি অনন্য। এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে শাহ সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থ বুঝা সহজ হয়ে যায়। সত্য কথা এই যে, কিতাবটি শাহ সাহেবের অন্যান্য কিতাবের সারমর্ম। এ কিতাবটিও শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

২৮) ফুয়ূজুল হারামাইনঃ এ গ্রন্থটিতে শাহ সাহেব সেই সমস্ত ব্যাপার সন্নিবেশিত করেছেন যা তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান কালে হযরত (সঃ)-এর রূহানী ফয়েযের মাধ্যমে হাসিল করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও কিতাবটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর।

২৯) আদদুররুস সামীন ফী মুবাশশিরাতে নবায়্যেল আমীনঃ এ কিতাবে শাহ সাহেব তাঁর পিতা শায়েখ আবদুর রহীম ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবুর রিজা মুহাম্মদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

৩০) হুসনুল আকীদাঃ আরবী ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটিতে আকায়েদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩১) ইনসানুল আইন ফী মাশায়েখিল হারামাইনঃ ফার্সী ভাষায় এ গ্রন্থটিতে শাহ সাহেব ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

৩২) আল মুকাদ্দামাতুস সুন্নিয়াত ফী ইনতিসারে ফিরকাতুস সুন্নিয়াহঃ এ গ্রন্থটিতে আরবী ভাষায় আকায়েদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এ গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য।

৩৩) আল মাকতুবুল সাদানীঃ এটি তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। তিনি ইসমাইল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রূমীর কাছে এ চিঠি লিখেছিলেন।

৩৪) আল হাওয়ামেহ ফী শরহে হিজবিল বাহরঃ এটি হিজবুল বাহর কিতাবের এক অতুলনীয় ভাষ্য।

৩৫) শেফাউল কুলুবঃ এটি ফার্সী ভাষায় তাসাওফের ওপর লেখা একটি অতি উত্তম গ্রন্থ।

৩৬) সারূরুল মাখযানঃ শায়েখ কবীরজান জানান দেহলভী (রঃ)-এর নির্দেশে শাহ সাহেব ফার্সী ভাষায় এ জ্ঞানগর্ভ কিতাবটি রচনা করেন।

৩৭) শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল বাকীর প্রশ্নাবলীর জবাবঃ

৩৮) তাইয়েবুন নগমা ফী মহ সাইয়্যেদিল আরবে ওয়াল আজমঃ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসাপূর্ণ একটি আরবী কাব্যগ্রন্থ।

৩৯) মজমুয়ায়ে আশআরঃ শাহ সাহেবের লিখিত বিভিন্ন কবিতার সংকলন গ্রন্থঃ

৪০) ফাতহুল ওয়াদুদ ওয়া মারিফাতিল জুনুদঃ এ সংক্ষিপ্ত আরবী রিসালায় শাহ সাহেব সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪১) আওয়ারিফঃ আরবী ভাষায় লেখা এ পুস্তিকাটিতে তাসাওফ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪২) শরহে রুবাইয়্যাতাইনঃ খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)-এর দুটি রুবাইয়্যাতের ব্যাখ্যা।

৪৩) আনফালুল আরেফীনঃ এটি শাহ সাহেবের রচিত একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতে তিনি তাঁর দাদা ও বংশের অন্যান্য জীবনালেখ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁদের জাহেরী ও বাতেনী ইলম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এতে সবিস্তারে আলোচনা রয়েছে।

ইন্তেকালঃ

শাহ সাহেব (রঃ) **১১১৪** হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেন এবং **৬৩** বছর বয়সে **১১৭৬** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাত্র অল্প ক'দিন তিনি হাল্কা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তারপর তিনি দুনিয়া ছেড়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন। পুরাতন দিল্লীর শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ ভাগে তাঁকে দাফন করা হয়। সে কবরস্থানকে মুহাদ্দেসীনের কবরস্থান বলা হয়।

সন্তান-সন্ততি

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ)- এর পাঁচটি ছেলে জন্ম নিয়েছিল। এক ছেলে যৌবনে পদার্পণ করেই মারা যান। তাই তার সম্পর্কে তাঁর জীবনী গ্রন্থে তেমন কিছু লেখা

হয়নি। অবশিষ্ট চার ছেলে যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তাঁর বংশকে সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর জ্যৈষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান শাহ আবদুল আযীয (রঃ) **১১৫৯** হিজরীতে জন্ম নেন এবং তাঁর সতের বছর বয়সে শাহ সাহেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর শৈশবের লেখাপড়া পিতার কাছেই সম্পন্ন হয়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি কোরআন পড়া শুরু করেন এবং তের বছর বয়সে তিনি নহু, ছরফ, ফিকাহ, মান্তেক, ইলমুল কালাম, আকায়েদ ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবসমূহ আয়ত্ত করেন। অতঃপর পনের বছর বয়সে রহীমিয়া মাদ্রাসায় তাঁর পিতার মসনদে বসে শিক্ষা দানে ব্রতী হন। তাঁর গোটা জীবন শিক্ষা দানে ও কিতাব রচনায় ব্যয়িত হয়। তাঁর যুগে রাফেজী ও অন্যান্য বাতিল পন্থীদের প্রভাব অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো কিতাব লিখেন। তাঁর রচিত তফসীরে আযীয ও তোহফায়ে ইসনা আশারিয়ায় তিনি রাফেজীদের বাতিল ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন ঘটিয়েছেন। তাছাড়া মুহাদ্দেসদের অবস্থা ও হাদীস সংকলনসমূহের ওপর তিনি বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন নামে এক তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। পরন্তু তিনি শরহে মিযানুল মান্তেক ও আযীযুল ইকতেবাস ফী ফাযায়েলে আখবারিন্নাস নামে আকায়েদের এক মূল্যবান ভাষ্য রচনা করেন। তার দ্বিতীয় সন্তানের নাম শাহ রফিউদ্দীন। তিনিও তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। শাহ রফিউদ্দিন কোরআন মজীদের সহজ উর্দু অনুবাদ করেন। সেটি অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ ও জনপ্রিয় হয়েছে। শাহ সাহেবের তৃতীয় ছেলের নাম শাহ আবদুল কাদের। তিনি তফসীর শাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন পছন্দ করতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আকবরাবাদ মাজে মসজিদের এক হুজরায় কাটিয়ে গেছেন। তিনি কোরআনের এরূপ উত্তম অনুবাদ করে গেছেন যা বড় বড়

তফসীরের কাজ দেয়। এ অনুবাদ ছিল ইলহামী অনুবাদ। উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম এক বাক্যে সেটাকে সর্বোত্তম অনুবাদ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর চতুর্থ ছেলের নাম শাহ আবদুল গনী। তিনি ইলমে তাসাওফে যথেষ্ট পারদর্শীতা অর্জণ করেন। তিনিও তার পিতার কাছে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। খোদা নির্ভরতা ও স্বল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁরই পুত্র হলেন বালাকোটের শহীদ শাহ ইসমাঈল (রঃ)। তিনি পাঞ্জাব ও সীমান্তে কিছু এলাকা দখল করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন। তাঁর "তাকবিয়াতুল ঈমান" ও "আল আবাকাত" কিতাবদ্বয় দেশ-বিদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সাজরা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) শাহ আঃ আযীয (রঃ) শাহ রফিউদ্দীন (রঃ) শাহ আঃ কাদের (রঃ) শাহ আঃ গণী মোঃ মূসা মোঃ ঈসা মোঃ মাখসুস উল্লাহ হাসান জান মোঃ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনামূলক ও জ্ঞানগত বিদ্যার ওপর সেকালে ও একালে বহু বই লেখা হয়েছে। প্রত্যেক মনীষীই জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। সে যুগে বর্ণনামূলক বিদ্যারই সর্বাধিক চর্চা চলছিল এবং এটাকেই তখন যথেষ্ট মনে করা হত। মুসলিম জাহান তখন রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছাকাছি যমানায় লালিত হচ্ছিল। তাই রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতের প্রভাবে হাজারো দর্শনের দার্শনিক মার প্যাঁচ তাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। তবে যতই ইসলামী দুনিয়ার প্রসারতা বেড়ে চলল আর এমনকি ইরান, হিন্দুস্তান ও পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন এলাকায় যখন তা ছড়িয়ে পড়ল, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের

দুষ্ট প্রভাব মুসলমানদের সহজ সরল ঈমান ও আকায়েদের মজবুত ভিত্তিকে দুর্বল করে দিল। ফলে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্যে এমন ব্যক্তিত্বের এ পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটালেন যাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিলেন। তারা শুধু ইসলামের জন্যেই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন না, পরন্তু দার্শনিকদের ভ্রান্ত চিন্তাধরার কল্পনার ফানুস ছিন্ন ভিন্ন করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। ইসলামের ওপর বারংবার হামলা করেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাকর পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই জোটেনি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) ও তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার আবির্ভাব ও সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ পাকের সেই মর্জিই সক্রিয় ছিল। শাহ সাহেব (রঃ) এ গ্রন্থটিতে শরীয়তের রহস্যাবলী তুলে ধরেছেন। পূর্বসূরীদের কেউই এ বিসয়ের ওপর কলম ধরেননি। শাহ সাহেব (রঃ) শরীয়তের মূলনীতি দাঁড় করেছেন, তার শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করেছেন। যদিও গ্রন্থখানি শরীয়তের রহস্যাবলীর ওপর তিনি লিখেছেন, তথাপি তিনি তাতে হাদীস, ফিকাহ, আখলাক, তাসাওফ ও দর্শনের সমারোহ ঘটিয়েছেন। উম্মতের ভেতর তিনিই প্রথম বর্ণনামূলক ও জ্ঞানগত বিদ্যার বিশেষজ্ঞ, যিনি শরীয়তের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু জ্ঞানানুসন্ধানের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাতের প্রতিটি নির্দেশের এরূপ অনড় কারণ খুঁজে বের করেছেনযা কোন যুগেই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে মনে হয় জ্ঞান ও যুক্তি শাস্ত্রের সকল স্তর আয়ত্তকারী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব কথা বলেছেন। কখনও মনে হয়, মালায়ে আলার ইলহাম পেয়ে আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা দিচ্ছেন। কখনও দেখা যায় যে, এক মুজতাহিদ এমন ভাবে মসআলা পেশ করছেন যাতে চার মজহাবের সমন্বয় ঘটে যাচ্ছে। এমনকি কিতাব ও সুন্নাতের বক্তব্যের সাথে

তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। আল্লামা আবু তাইয়্যেবা (রঃ) “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” সম্পর্কে বলেনঃ

“যদিও গ্রন্থটি ইলমে হাদীস নয়, তথাপি তাতে হাদীসের প্রচুর ব্যাখ্যা মিলে। এমনকি তাতে বিভিন্ন হাদীসের তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। সে যাক, পূর্ববর্তী বার শতকে আরব-আজমের কোন আলেম এরূপ মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে যাননি। গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য। মোটকথা, গ্রন্থকারের এটা শুধু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই নয়, সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ”। শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর গ্রন্থটিকে দু’খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। পয়লা খণ্ডটি সাত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন।

প্রথম খণ্ড

পয়লা খণ্ডে শাহ সাহবে (রঃ) শরীয়তের সেসব রহস্য ও নীতিমালা তুলে ধরেছেন যদ্বারা শরীয়তের বিধি-নিষেধসমূহ সহজেই বের ও উপলব্ধি করা যায়। অতঃপর তিনি পয়লা অধ্যায়ে মানুষকে কেন জবাবদিহি করা হবে আর কেন তাদের পুরস্কার বা শাস্তি দান করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে তেরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পয়লা পরিচ্ছেদে সৃষ্টির উন্মেষ ও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। যেহেতু সৃষ্টিতত্ত্বই সব কিছুর আদি প্রশ্ন, তাই তিনি সর্বাগ্রে সেটারই সমাধান দিয়েছেন। আর স্বভাবতঃই সামগ্রিক জ্ঞানের জন্যে রচিত গ্রন্থে এটাই সর্বাগ্রে ঠাঁই পাবে। আমরা যদি সর্বাগ্রে অবতীর্ণ আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলেও দেখতে পাই, সেখানেও সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যেমনঃ

অর্থাৎ, "সেই প্রভুর নামে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু রক্তপিণ্ড থেকে"। (সূরা আলাক্বঃ আয়াত ১-২)

শাহ সাহেব (রঃ) ও আল্লাহ পাকের এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অতঃপর তিনি আলমে মেসাল (নমুনা জগত) মালা-এ-আ'লা (উচ্চতর পরিষদ), হাকীকাতে রূহ (আত্মাতত্ত্ব) ও জবাবদিহি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সবাইকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। ভাল কর্মের জন্যে ভাল ফল ও মন্দ কর্মের মন্দ ফল পাবে। তিনি এটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা চার কারণে হবে। এক, যে প্রাকরের কাজ সেই প্রকারের ফল হওয়াই স্বাভাবিক। দুই, মালা-এ-আ'লার সিদ্ধান্ত এটাই। তিন, শরীয়তের চাহিদাও তাই। চার, হুযুর (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর এবং তাঁর দোয়া ও আল্লাহ পাকের সাহায্যের আশ্বাস স্বভাবতঃই সেটাকে অপরিহার্য করেছে। অতঃপর তিনি বলেন, কর্মফলের পয়লা দুটি দিক হল স্বাভাবিক। তার পরিবর্তন অসম্ভব। তৃতীয়টি কালের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। চতুর্থটি নবী প্রেরণের পরে দেখা দেয়। অবশেষে তিনি কার্যকারণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে পয়লা অধ্যায় শেষ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি পার্থব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অর্থাৎ মানুষের সর্বাংগীন জীবন-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিয়ে আমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারি অতি চমৎকার ভাবে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন কিভাবে সুখময় ও সুন্দর হতে পারে তা তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এ অধ্যায়টিকে তিনি এগারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। পয়লা পরিচ্ছেদে মানবিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকারের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর বিভিন্ন

প্রয়োজন ও অধিকারের বাস্তবায়ন পদ্ধতি বলেছেন। ফলে নাগরিক জীবন, পারস্পরিক লেন-দেন, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিভিন্ন দিক এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যা দেখে অত্যাধুনিক কালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরাও হতভম্ব হয়ে যায়। শাহ সাহেব (রঃ) শাসকদের জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেনঃ শাসককে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের হতে হবে। তাকে এক দিকে বীরের মত শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে জন কল্যাণের প্রয়োজনে, অপর দিকে তাকে দয়ালুও হতে হবে। তাকে বিজ্ঞ হতে হবে যাতে ইসলামী বিধি-নিষেধগুলোর তিনি যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন। তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান এক স্বাধীন পুরুষ হতে হবে। তা না হলে তার প্রভাব জনগণের ওপর পড়বে না। তাকে পূর্ণাঙ্গ দেহের এক সুস্থ ব্যক্তি হতে হবে। তা না হলে জনগণ তাকে যথাযথ সম্মান দিতে পারবে না। তাকে দাতা ও সামাজিক হতে হবে, তা হলে জনগণ তাকে ভালবাসবে। তাকে জন কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হতে হবে, তা হলে জনগণ তাকে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ভাববে। তাকে চতুর শিকারীর দূরদর্শিতা নিয়ে জনগণের সাথে ব্যবহার বজায় রাখতে হবে এবং সময়সুযোগ মতে শিকারের কাজ করতে হবে। তার বড় কাজ হবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। এভাবে অল্প কতায় তিনি জনপ্রিয় শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। শেষ পরিচ্ছেদে তিনি জনগণের ভেতরে বিভিন্ন রীতি-নীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি সৌভাগ্য নিয়ে আলোচনা করেন। সৌভাগ্য কাকে বলে এবং সৌভাগ্য সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে মানুষের ভেতরে কি কি মতভেদ রয়েছে এবং সৌভাগ্য অর্জনের উপায় নিয়ে তিনি এ অধ্যায়ে সমিস্তারে আলোচনা করেছেন। সৌভাগ্যের অধ্যায়টিকে তিনি তাওহীদ, শির্ক ও ঈমানের ওপর আলোচনা করেছেন। তাছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও

যাকাত এবং তার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান নিয়েও আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ এগুলোর রহস্য ও তত্ত্ববিশ্লেষণ করেন। পরিশেষে পাপের স্তরভেদ, পাপের ক্ষতি-সমূহ, বিশেষতঃ পাপ কি করে কোন ব্যক্তি বা সমাজকে ধ্বংস করে তা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। তেমনি তুলে ধরেছেন পুণ্য কি ব্যক্তি ও সমাজকে ইহলোক ও পরলোকের শান্তি ও সুখের পথ খুলে দেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি জাতীয় রাজনীতির ওপর আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়টিকে তিনি একুশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। দ্বীন ও মিল্লাতের বিভিন্ন ব্যাপারে জাতির পথপ্রদর্শক সম্প্রদায়, অতীতের ধর্মসমূহ, ইসলাম ও জাহেলী যুগের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেন। তাছাড়া এতে শরয়ী ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন রহস্য ও তত্ত্বকথা তিনি তুলে ধরেছেন। সপ্তম বা শেষ অধ্যায়টিকে তিনি এগারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। তাতে নবুয়তী জ্ঞানসমূহ, হাদীস সংকলনাদি, সাহাবা, তাবেঈন ও ফকীহদের মতভেদ ও মতামতের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। শেষভাগে তিনি তাহারাত ও সালাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এভাবেই পয়লা খণ্ড সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ দ্বিতীয় খণ্ডে ইবাদত, সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বাগ্রে তিনি নামায, রোযা ও হজ্জের পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। এ খণ্ডকে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেননি, বরং প্রত্যেকটি আলোচনা স্বতন্ত্র শিরোনাম দিয়েছেন। কায়িক আত্মিক ইবাদত সম্পর্কে আলোচনার পর ব্যবসা-বাণিজ্য, রুজীরুটি উপার্জনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

কারণ, ইবাদত কবুলের ভিত্তিই হল হালাল রুজী। এ কারণেই ব্যবসায়ের রীতিনীতি ও অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণকে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনাই ইবাদত কবুলের চাবিকাটি। এরপর পারিবারিক ব্যবস্থার পরিচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন। বিয়ে, তালাক, স্ত্রীর অধিকার, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির ওপর সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। অতঃপর দেশ ও জাতি সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছেন। খেলাফত, বিচার পদ্ধতি, দণ্ডবিধি, সমরনীতি ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। তাঁর এ আলোচনা এতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, এ কালের পণ্ডিতরাও দেখে অবাক হয়ে যায়। অবশেষে শাহ সাহেব জনসাধারণের সাধারণ জীবন যাপনকে বিভিন্ন রীতিনীতি আলোচনা করেছেন। আচার- আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাকার ব্যাপারে তিনি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবশেষে সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরে তিনি তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন । এই বইটি এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে মার্কসবাদী দর্শনের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও লেলিন এই বই থেকে সার সংগ্রহ করে তাঁদের মার্কসবাদী ম্যানিফেস্টো তৈরী করেছিলেন । শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনটুকু বাদ দিয়ে দেন ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর মাদ্রাসা

শাহ সাহেবের পিতা শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ) এর মারা যাবার পর তিনি পিতার তৈরী করা মাদ্রাসা 'মাদ্রাসা-ই-রহীমিয়া'য় অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন । তাঁর পিতা ১১শ শতাব্দীর শেষে ১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই মাদ্রাসাকে স্থাপন করেন ।

শাহ সাহেবের জ্ঞান ও গবেষণার খ্যাতি যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিভিন্ন স্থান থেকে অধ্যায়নের জন্য ছাত্ররা এসে ভিড় করতে থাকে । ফলে পুরাতন অট্টালিকায় স্থান সংকুলান অসম্ভব হয় । তখন মুঘল সম্রাট শাহ আলম শাহ সাহেবকে ডেকে শহরের একটি বড়ো অট্টালিকায় দারুল হাদীস স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন । এই অট্টালিকাটি সম্রাট শাহ আলম দান করেন । পুরাতন মাদ্রাসার স্থান জনশূন্য হয়ে পড়ে । এই নতুন মাদ্রাসাটি এক সময় খুব বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ ছিল । বস্তুতপক্ষে একে উচ্চস্তরের দারুল উলুম বা বিশ্ববিদ্যালয় বলা হত । মাদ্রাসাটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষত ছিল । ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের সময় এটি ধ্বংস হয়ে যায় । মাদ্রাসার দরজা জানালা এবং তার কড়ি বরগা লুণ্ঠিত না হলে মনে হয় সেটা আজও পর্যন্ত অক্ষত থাকত । শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রই এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করেন এবং ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্ররুপে এ মাদ্রাসা খ্যাতি অর্জন করে । শাহ সাহেবের পুত্রদের অবর্তমানে শাহ ইসহাক মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) এ মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক (রহঃ) এর ১২৫৬ হিজরীতে মক্কা শরীফ হিজরত করার পর মাওলানা রফিউদ্দীনের প্রতিনিধি মাওলানা মাখসুসুল্লাহ এবং মাওলানা মুসা এ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধান করেন । আব্দুস সালাম নামে এক শিশু পুত্র রেখে মাওলানা মুসা ইন্তেকাল করেন । মাওলানা মাখসুসুল্লাহও ইন্তেকাল করেন । তখন খান্দানে নাবালক আব্দুস সালামকে শিক্ষা দেওয়ার মত আর কেউ বেঁচে ছিলেন না । মোট কথা কয়েক পুরুষ পরে তাঁদের এই ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায় । তারপর সম্পূর্ণ সম্পত্তি রায় বাহাদুর লালা শিব প্রসাদের হাতে হস্তাগত হয় । এই জন্যই সেই গলিতে ‘মাদ্রাসা-ই-লালা রামকিষন দাস’ ফলক লাগালো হয়েছে ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর আন্দোলন

আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ঃ (হিজরী ১১৩১ – ১১৭৬)

১৭১৭ সালে যখন ইংরেজরা মহীশূরের এক এলাকা দখল করে নেয় ঠিক সেই সময় থেকেই ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি রচনা হয় । এবং ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে বেশ কয়েকটি সুবার শাসনভার গ্রহণ করে বানিজ্য বসতির পথ প্রসস্ত করে । এই বিষয়টি সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) । তিনি দেখেন ইংরেজরা তখন চারটি সুবার শাসনকর্তা । শাহ সাহেব নিজে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে যেতে পারেন নি । তবে তিনি ব্রিটিশ বিতাড়নের পথ প্রসস্থ করে গিয়েছিলেন । তাঁর মহান পুত্ররা তাঁর আন্দোলনকে সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেন ।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে শাহ সাহেবের মৃত্যু হলে তাঁর উপযুক্ত পুত্র শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আন্দোলনের হাল ধরেন । যখন শাহ সাহেব মারা যান তখন শাহ আব্দুল আজিজ এর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর । শাহ সাহেবের প্রতির্ষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ শাহ আব্দুল আজিজকে ইমাম মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করেন । প্রথমে তাঁকে শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক আন্দোলনের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেবার ব্যাবস্থা হলো । মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন তাঁকে হাদীস এবং সংস্কার আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষা দান করেন । শাহ আব্দুল আজিজের শ্বশুর মাওলানা সুরুল্লাহ তাঁকে ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন । এভাবে শাহ আব্দুল আজিজকে শাহ সাহেবের যোগ্য উত্তরাধীকারীরুপে গড়ে তোলা হয়েছিল । শাহ সাহেবের যুগে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট ছিল কিন্তু শাহ আব্দুল আজিজ এর যুগে মুসলিম সম্রাটদের প্রাণশক্তি বলতে কিছুই বাকি ছিল না । ব্রিটিশরা পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছিল । তখন শাহ আব্দুল আজিজই ইংরেজ উচ্ছেদের কল্পে জেহাদের ফতোয়া জারি করেন । শাহ আব্দুল আজিজের এই

ফতোয়াকে কেন্দ্র করেই এদেশে মুসলমানরা প্রথম স্বাধীনতার জন্য শহীদ হতে রাজী হন । পরবর্তীকালেও ‘রেশমী রুমালে’র আন্দোলনের মূলেও ছিল এই ফতোয়া ।

এই ফতোয়ার মূলেই ছিল সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) আন্দোলন । পরে তিনি এবং তাঁর মূরীদ সৈয়দ শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) পাঞ্জাবের বালাকোটের ময়দানে শহীদ হন । পরে যখন এই আন্দোলন আরও বিস্তৃতি লাভ করে তখন মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী প্রভৃতিরা এই আন্দোলনে শরীক হন ।

শাহ সাহেবের অনুসারীরা ইংরেজদের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল । ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল যে, শাহ সাহেবের জ্ঞান, গবেষণা দর্শন, লোকেদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে । সে সময় যদি ইংরেজ জাতি উপমহাদেশের মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে শিকড় না গেড়ে ফেলত তাহলে শাহ ওয়ালীল্লাহর সংস্কার আন্দোলনই শক্তি দখল করতে সমর্থ হত । ইংরেজদের প্রাধান্য ওয়ালীল্লাহর আন্দোলনের পথে শুধু অন্তরায় হয়েই দাঁড়িয়েছিল না বরং তাঁদের চক্রান্তে সে আন্দোলনের রুপকে বিকৃত করে তুলে ধরা হয়েছিল । এই বিকৃত করে তুলে ধরার জন্য তারা কিছু আলেম নামধারী জিন্দিকদেরকে ও কবরপুজারী মুশরিকদেরকে দিয়ে উক্ত আন্দোলনের কর্ণধার উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের ফতোয়া দেয় এবং আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা করে । কিন্তু শেষমেষ সে চক্রান্ত ব্যার্থ হয় ।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ (হিজরী ১২৪৬ – ১৩৩৯)

এই আন্দোলন শুরু হয় **১২৪৬** হিজরীতে এবং এই আন্দোলনের জনক ছিলেন শাহ ইসহাক (রহঃ) । **১৩৩৯** হিজরীতে দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পরেই এই আন্দোলনের যবনিকাপাত হয় ।

বালাকোটের ঘটনার পরে সুদীর্ঘ **১১** বছর ধরে আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করার পর শাহ ইসহাক আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী তৈরী করেন । তাঁর এই কর্মসূচীতে দুটি মূলনীতি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল । সেগুলি হল-

১) হানাফী মাযহাবের অনুসরণ ।
২) তুর্কী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ।

এই আন্দোলনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এবং শাহ আব্দুল আজীজ (রহঃ) এর আদর্শ এবং কর্মপন্থা যারা পুরোপুরি সমর্থন করেন না তাদেরকে এই আন্দোলনের সম্পর্ক থেকে মুক্ত করা হয় । ফলে এই আন্দোলন ইয়ামেনী ও ওহাবী নজদী আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায় । এতে অধিকাংশ উপমহাদেশীয় মুসলমানকে এর মধ্যে আকর্ষন করতে সমর্থ হয় । আন্দোলনকে দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করা হয় যে, আন্দোলনের সব নেতা হানাফী ফিকাহ এবং উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক দর্শন পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায় তারা আসলে শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত । তারপর যারা হানাফী ফিকাহ এবং তাসাউফকে অস্বীকার করত সেই হানাফী মাযহাব বিরোধী ফিরকাকে ওয়ালীউল্লাহ-পন্থী মুসলমানগণ ছোট রাফেযী বলত ।

দারুল উলুম দেওবন্দ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজরা হাজার হাজার উলামাকে শহীদ করে । শাহ সাহেবের পিতার প্রতিষ্ঠা করা মাদ্রাসা 'মাদ্রাসা-ই-রহীমিয়া' ও এই মহাবিদ্রোহের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এর আন্দোলনের প্রধান কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাঁরা ১৮৫৭ সালে হিজাজে হিজরত করেন, তাঁরা দিল্লী মাদ্রাসার আদর্শে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন । দিল্লী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শাহ আব্দুল আজীজ (রহঃ) এর যুগে এবং সেখানে অধ্যপকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাই, তারপর রশীদুদ্দীন দেহলবী, তারপরে মামলুক আলী দেহলবী । ১৮৫৭ব সালের মহাবিদ্রোহের সময় এই মাদ্রাসাও বন্ধ হয়ে যায় ।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহঃ), ইমাম আব্দুল গণী দেহলবী (রহঃ) এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ পন্থী বিশিষ্ট নেতারা হিজাজে এ আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করতে চেয়েছিলেন; এবং সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় এ আন্দোলন নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । ভারতীয় উপমহাদেশের আমীর হাজি ইমদাদুল্লাহ (রহঃ) এর প্রতিনিধি ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুবী (রহঃ) । হাজি ইমদাদুল্লাহ (রহঃ) একসময় বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দাকে এক একজন লিসান (মুখপাত্র) দিয়ে সাহায্য করেন । শামস তাবরেজীর জন্য মাওলানা রুমি ছিলেন মুখপাত্র । তেমনি মাওলানা কাসেমকে আমার মুখপাত্র রুপে সৃষ্টি করা হয়েছে । আমার মনে যা জাগরিত হয় মাওলানা কাসেমের মুখ থেকে তাই প্রকাশ পায় ।

এই মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) ১৮৬৬ সালে (১২৮৩ হিজরী) উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ নামক ছোট্ট শহরে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । বর্ণিত আছে নবী (সাঃ) মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)কে স্বপ্নের জানিয়েছিলেন এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য । এই

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) শাহ সাহেবের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাহিদদের অন্যতম ছিলেন । শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতবাদ তিনি সমকালীন উপমহাদেশীয়দের সম্মুখে যুগোপযোগী রুপ দিয়ে পেশ করেন । অসংখ্য জ্ঞান পিপাসুর তিনি উৎস ছিলেন-তাদের মধ্যে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) একজন ছিলএন । পরবর্তীকালে তিনি দেওবন্দ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের ইমাম এবং অগ্রনায়ক ছিলেন । মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতির দরিদ্র জনসাধারণ-আমীর এবং বিশিষ্ট শ্রেণী নয় । এ আন্দোলনের একমাত্র আল্লাহর মদদের উপর নির্ভরশীল ছিল । সুতরাং দেওবন্দ আন্দোলন উচ্চ শ্রেণীর সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত ছিল । মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ ১২৯৭ হিজরীতে । মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলবীর ব্যাক্তিত্বের ছাপ ছিল তাঁর চরিত্রে ।

মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) একজন কবিও ছিলেন । তিনি এতবড় আশেকে রাসুল (সাঃ) ছিলেন যে মদীনা শহরে প্রবেশের ৭ মাইল আগেই জুতো খুলে নিতেন এই ভেবে যে চোদ্দশ বছর আগে মহানবী (সাঃ) এই পথে হাঁটাচলা করেছেন ।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রসাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে দেওবন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ), মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ), মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ), মাওলানা হসরত মোহানী (রহঃ) প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী জামাতের নেতারা ।

মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিশিক্ত হন মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) । তিনি পবিত্র কুরাআন, হাদীস ও ফিকাহ শস্ত্রের পাশাপাশি তাসাওফের পণ্ডিত ছিলেন । তিনি হাজি ইমদাদুল্লাহ (রহঃ) এর কাছ থেকে চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দীয়া এবং সোহরাবর্দীয়া তরিকার উপর দীক্ষা নিয়ে আধ্যত্মিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন ।

আন্দোলনের বিভক্তি

পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ) এর শাহাদাতের বিষয়কে কেন্দ্র করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এর সমাজ সংস্কারক ও দেশাত্মবোধক আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । নেতৃস্থানীয়দের বেশীরভাগ বিশ্বাসী ছিলেন যে সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) শহীদ হয়েছেন । অন্যদল বিশ্বাসী ছিলেন যে সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) শহীদ হননি । তিনি জীবিত রয়েছেন । তিনি শিঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন । এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল । মাওলানা ইসহাক (রহঃ) এবং তাঁর দলবল সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) এর শাহাদাতের বিষয়টাকে সমর্থন করতেন । কিন্তু মাওলানা বিলায়েত আলী সাদেকপুরী সাহেবের বিশ্বাস ছিল সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) শহীদ হন নি । বরং তিনি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছেন । মাওলানা বিলায়ত আলী ছিলেন মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহঃ) এর বিশিষ্ট সহচর । সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) জিহাদের প্রচারে তাঁকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতেন । বালাকোটের ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না । সেজন্যই তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) এর শাহাদাতের ঘটনা বিশ্বাস করতে পারেন নি । এই জন্যই দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল ।

এই সাদেকপুরী দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী । তিনি দিল্লীতে বসবাস করতেন । তিনি ১২২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৭ হিজরী পর্যন্ত সাদেকপুরেন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন । ১২৭৪ হিজরীর পরে তিনি স্বাধীনভাবে ইজতেহাদ শুরু করেন । তবে অনেক বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এর পৌত্র শাহ ইসমাইল শহীদের অনুসরণ করতেন ।

সাদেকপুরী জামাতের মধ্যে একজন ছিলেন নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী । তিনি আব্দুল হক বেনারসীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন । আব্দুল হক বেনারসী আবার ইয়ামেনের যায়দিয়া শিয়া আলেম ইমাম শাওকানীর কাছে থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন । আব্দুল হক বেনারসী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরী শিয়া হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা আরম্ভ করেন । 'তাম্বিহুদ্বাল্লীন' কিতাবে লেখা আছে, "সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রহঃ) এর জেহাদী দলের বিরোধীতা করার জন্য মাওলানা আব্দুল হক বেনারসীকে দল থেকে বিতাড়িত করেন । তিনি মক্কা শরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন, কিন্তু তার জেহাদ বিরোধী আকিদা জানতে পেরে মক্কা মদীনার উলামাগণ তার হত্যার আদেশ ঘোষণা করেন । সেখান থেকে কোন রুপে পলায়ন করে বেনারসে এসে আশ্রয় নেন । তাঁর অধিকাংশ মতবাদ রাফেযী মিশ্রিত ছিল । তিনি নিজেকে খলিফা আমীরুল মোমেনীন বলে ঘোষণা করেন ।" (তাম্বিহুদ্বাল্লীন পৃষ্ঠা-২)

এই সাদেকপুরী জামাত যখন থেকে ইয়ামেনের যায়েদী শিয়াদের, জাহেরিয়া মতাবলম্বীদের সাথে ও আরবের মেলামেশা শুরু করে ঠিক তখন থেকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) ও শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । এরপর উক্ত দুটি জামাতের মত ও আদর্শে অনেকখানি ব্যাবধান সৃষ্টি হয় । মুশরিকদের আদৌ ক্ষমা না পাওয়া এবং দুয়ায় কোন ওসীলা অবলম্বন এই দুটি ব্যাপারে উপরোক্ত দুই জামাতের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান । ইসমাইল

শহীদের আল আবকাত পাঠ করলে শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) ওয়াহদাতুল ওজুদ সম্পর্কে তাঁর এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং হাম্বলী মতাবলম্বীদের মতামতের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় । মাওলানা নাযীর হুসাইন দেহলবী ইবনুল আরাবীকে কাফের বলে স্বীকার না করার প্রশ্নে ইসমাইল শহীদের অনুসারী ছিলেন । এই মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব শায়খ ইবনে আরাবীর ব্যাপারে ভালো আকিদা রাখতেন এবনহ তাঁকে এবং তাঁকে 'খাতেমুল বিলায়াতিল মুহাম্মাদীয়া' উপাধীতে স্মরন করতেন এবনহ তাঁর প্রসংসা করতেন । মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবীর জীবনী লিখেছেন মাওলানা ফাযলে হাসান বিহারী '***<u>আল হায়াত বা'দাল মামাত</u>***' নামে। সেখানে লেখা আছে,

"(মাওলানা মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব) যখন '***<u>কিতাবুর রাকায়েক</u>***' এর শিক্ষা দিতে এবং তাসাউফের সত্যতা বর্ননা করতেন তখন বলতেন, সাথীগন ! এখানে জ্ঞানের সমুদ্র দেখা যাচ্ছে । এই কারনেই তিনি উলামাদের তাবাকাতের মধ্যে শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীকে বড়ই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং বলতেন শায়খ ইবনে আরাবী 'খাতেমুল বিলায়াতিল মুহাম্মাদীয়া' ছিলেন ।" (হায়াত বা'দাল মামাত, পৃষ্ঠা-১২৩)

এখানে উস্তাদ মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী এবনহ তাঁর ছাত্ররা একমত যে মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) 'খাতেমুল বিলায়াতিল মুহাম্মাদীয়া' ছিলেন । এবং ছাত্র একথা বাড়িয়ে বললেন, "প্রকাশ্য এবং গোপন জ্ঞান জমাকারী, একাকী শ্রেষ্ঠত্যের অধিকারী ছিলেন । '***<u>আল হায়াত বা'দাল মামাত</u>***' এর মধ্যে আরও লেখা আছে,

"মাওলানা কাজী বশীরুদ্দীন কনৌজী শায়খ ইবনে আরাবীর বিরোধী ছিলেন । একবার মিঁয়া নাযীর হুসাইনের সঙ্গে শায়খে আকবর (ইবনে আরাবী) এর ব্যাপারে

আকিদা নিয়ে দিল্লিতে মুনাযারা করতে এলেন এবং দুই মাস পর্যন্ত দিল্লীতে ছিলেন। প্রত্যেক দিন মুনাযারার মজলিস লাগত কিন্তু মিঁয়া সাহেব নিজের আগের ধ্যান-ধারনা থেকে পিছু হাটলেন না । শেষ পর্যন্ত কাজী সাবেব দুই মাস পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন ।” (আল হায়াত বা’দাল মামাত, পৃষ্ঠা-১২৩)

সুতরাং মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ) কে সম্মান করতেন এবং তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরোধী ছিলেন না । এমনকি তিনি ওয়াহদাতুল ওজুদের স্বপক্ষে মুনাযারাও করেছেন ।

সাদেকপুরী জামাতের নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীও ইবনুর আরাবীকে কাফের বলতেন না । তিনি ‘আত্তাজুল মুকাল্লাল’ গ্রন্থে ইবনুল আরাবীকে কাফের নয় বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, “তকলীদ তরক করার ব্যাপারে এবং দলীল মোতাবিক আমল করার ব্যাপারে শায়খ ইবনে আরাবীর বাণী অন্য ব্যাক্তির বানীর থেকে উত্তম এবং এই ব্যাপারে খোদাপ্রেমে আত্মহারা এবং আকর্ষনে ঘেরা বর্ননায় পরিপুর্ন । যাক আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আমাদের সমগ্র মুসলমানদের তরফ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন । তাঁর আলোকে যেন আমাদেরকে ফায়েজ দান করুন । তাঁর গোপন এবং বাতিনি পোষাক যেন আমাদের পরান । তাঁর জ্ঞানের মদীরার উত্তাপে যেন আমাদেরকে পুর্ণ করে দেন এবং তাঁর সাথীদের দলে আমাদের যেন হাশর দান করেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাহাত্মের সদকায় আমাদের এই দুয়া কবুল করুন ।” (আত্তাজুল মুকাল্লাল, পৃষ্ঠা-১৮০)

নবাব সিদ্দিক হাসান খানের মতে ইবনে আরাবী সম্পর্কে কোনরুপ বিতর্ক না করা সংগত । তাঁর যে মতগুলি বাহ্যত শরীয়াতের খেলাফ বলে দেখা যাবে, সেগুলির সদর্থ গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি কুফরী আরোপ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ ।

ইবনুল আরাবীর ব্যাপারে শাহ ইসমাইল শহীদের ব্যাপারে সাদেকপুরী জামাত একমত হলেও তারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) এর পরে সাদেকপুরী জামাত শাহ সাহেবের মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেও শাহ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরসূরী উলামায়ে দেওবন্দ শাহ সাহেবের পথে এখনও কায়েম আছেন । আর ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন । কারণ শাহ সাহেবের মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখার জন্যই উলামায়ে দেওবন্দের উত্থান এবং তাঁরাই শাহ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরসূরী ।

সাজরা

শাহ ওয়ালীউল্লাহর বংশের সাজরা

শায়খ শামসুদ্দিন মুফতী

শাহ ওয়াসিহুদ্দিন

]

শাহ আব্দুর রহীম

শাহ আহলুল্লাহ | শাহ ওয়ালীউল্লাহ

শাহ আব্দুল আযীয | শাহ রফিউদ্দীন | শাহ আব্দুল কাদের | শাহ আব্দুল গণী

মাওলানা আব্দুল হাই | মাখসুসুল্লাহ | ইসমাইল শহীদ দেহলবী
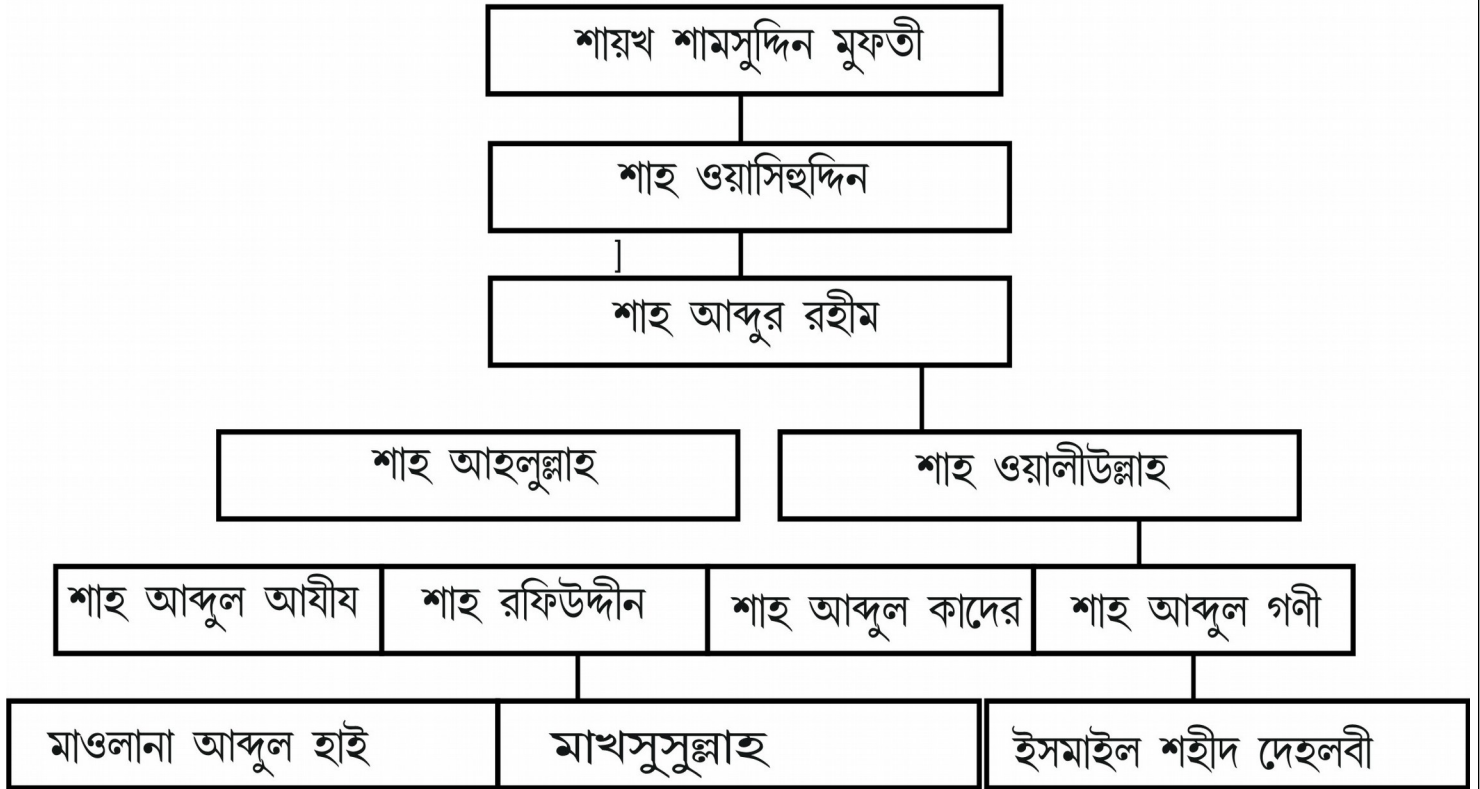
ভারতে ওহাবী আন্দোলন ও সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী

ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত বুযুর্গ, আমাদের তথা কওম ও মিল্লাতের গৌরব সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ভারতের ওহাবী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ । তিনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী ১২০১ হিজরীর মুহাররম মাসে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি জন্মসূত্রে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর বংশধর । তিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর পূত্র শাহ আব্দুল কাদিরের আধ্যাত্মিক শিষ্য । সৈয়দ

আহমদ শহীদ এতটাই স্বদেশভক্ত ও কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় পান নি । তাঁর দৈহিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ । ছোটবেলা থেকেই তিনি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতেন । পরে তিনি যোগ দিলেন ‘এক ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুর সেনাবাহিনীতে; শিখলেন সামরিক রণকৌশল । এর সঙ্গে অন্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম ।’ কিন্তু ঐ সামন্তপ্রভূ ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে তিনি ঘৃণাভরে চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে বাড়ি ফিরলেন । এই সময় ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে তিনি মর্মাহত হন । এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, “তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসী মুসলমানদের অন্তর হইতে ইসলামের মূল আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কয়েক শতাব্দী কাল পৌত্তলিক হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার দরুন মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং আচার আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড সমূহে বহুল পরিমাণে শেরেক বেদআত প্রবেশ করিয়াছে । ইসলামের আদর্শ এবং শিক্ষা ও সৌন্দর্য যে পৌত্তলিকতার মালিন্য দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তিনি বিশেষ রুপে অনুভব করিয়া উহা সংস্কারের জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ।” (Indian Musalman, অনুবাদ-মাওলানা আহমদ আলী)

সেইজন্য সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪ বছর বয়সে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন । যখন সৈয়দ আহমদ শহীদ দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করছিলেন তখন শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মূরীদ হন । যদিও তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের থেকে বয়স ও জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে অগ্রণী ছিলেন । মাওলানা

আব্দুল হাই শামসুল উলামা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর বিশিষ্ট ছাত্র ও জামাতা ছিলেন । তাঁরই অনুরোধে এবং প্রেরণায় হযরত আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবীও সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মূরীদ হন । আর শাহ ইসমাইল শহীদও বয়স ও জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে সৈয়দ আহমদ শহীদের অগ্রণী ছিলেন । শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর ভাইপো শাহ ইসমাইল শহীদকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, তা সত্বেও এঁরা সৈয়দ আহমদ শহীদকেই আধ্যাত্মিক গুরু তথা মুর্শিদ রুপে গ্রহণ করেছিলেন । দেওবন্দীদের শায়খুল মাশায়েখ হাজি আব্দুর রহীম বেলায়তী (রহঃ) বিরাট রুহানী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । তা সত্ত্বেও তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের কাছে আত্মসমর্পন করে তাঁরা কাছে মুরীদ হন এবং নিজ মুরীদ নুর মুহাম্মাদ ঝানঝনাভীকেও দীক্ষিত করেন । সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা তাঁর ভক্তদেরকে মুগ্ধ করেন ।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতায় আসেন এবং তাঁকে সকলেই অত্যান্ত সম্মানের সাথে সংম্বর্ধনা করেন । বাংলার কয়েক হাজার মুসলিম নরনারী তাঁর হাতে মুরীদ হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেন । এই প্রসঙ্গে ইউলিয়াম হান্টার লিখেছেন, "In Calcutta the masses flacked to him (to sayyed Ahmad) in such a number, that he was unable even to go through the ceremony of invitation by the Separate laying on hands. Unrolling his turban, there force, he declared that all who could touch any part of its ample length, become his disciples." (The Indian musalman)

সৈয়দ আহমদ শহীদের সব থেকে উল্লেখযোগ্য মুরীদ ছিলেন হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) । তিনি **১৭৬৯** খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী **১২ই** রবিউস সানী, **১১93** হিজরী সনে উত্তর প্রদেশের মুযাফফার নগর জেলার ফুলাতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ আব্দুল গণী দেহলবী (রহঃ) এবং পিতামহ ছিলেন মুসলিম জাহানের বিখ্যাত চিন্তাবিদ মুহাদ্দিসে আজীম, ওলীয়ে কামিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) । শাহ ওয়ালীউল্লাহর চার পুত্রের মধ্যে অপর তিনজনের নাম যথাক্রনে, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এবং শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) । নতুন দিল্লীর 'মেহদীয়ান' এলাকায় এখনও তাঁদের মাযার বর্তমান রয়েছে । শাহ ইসমাইল শহীদের মাতার নাম ফাতেমা এবং মাতামহের নাম হযরত মাওলানা আলাউদ্দিন ফুলাতী (রহঃ) ।

শাহ ইসমাইল শহীদ মাত্র আট বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয (মুখস্ত) করেন এবং অতি অল্প বয়সে কুরআন পাকের মানে মতলবও শিখে নেন । তিনি দুই তিন বছরে আরবী ব্যাকরণের নুহু-সরফ (Syntax & Elymology) আয়ত্ব করেন । তিনি ছয় সাত বছর বয়সে জ্যাতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি বিষয়েও অধ্যয়ন করেন ।

তাঁর পিতা শাহ আব্দুল গণী যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর । (**১২ই** এপ্রিল **১৭৭৯**) । ইন্নালিল্লাহি .... । এর পর তাঁর ভরণ-পোষনের

দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর চাচা শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) । তিনি এবং শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করেন । তিনি বারো বছর বয়সে যুক্তি বিজ্ঞানের জটিল গ্রন্থ 'সদরা' পড়তে আরম্ভ করেন এবং আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র, ফিকাহ, যুক্তিবিজ্ঞান, হিকমত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে চাচা আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে থাকেন । মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । তৎকালীন দিকপাল উলামারা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি জানান ।

মিঁয়া রহীম বক্সের নিকট অশ্বারোহনেও পারদর্শিতা লাভ করেন, দুর্দান্ত অশ্বের পৃষ্ঠে সহজেই উঠে, 'ছুট কাটাতে' পারতেন, আবার ইচ্ছামত সহজেই নেমে যেতে পারতেন এর জন্য পাদানী বা জিনপোষের প্রয়োজনই হত না । বিভিন্ন অস্ত্র চালনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । বন্দুকের গুলি ছোঁড়ায় খুব সুন্দর নিশানা লাগাতে পারতেন । কুস্তি পড়তে পারতেন । খুব সুন্দর সাঁতার কাটতে পারতেন । দিল্লীর 'সিদরাতুল মসজিদ' এলাকা থেকে জমুনার খরস্রোতে সাঁতার দিয়ে আগ্রার তাজমহল পৌঁছে যেতেন, আবার সাঁতার কেটে দিল্লী শহরে চলে আসতেন । প্রচণ্ড রোদে জামে মসজিদের উত্তপ্ত চত্তরে দীর্ঘ সময় পায়চারী করতেন । ভয়ঙ্কর হাড় কাঁপানো শীতে সাধারণ কাপড়-চোপড় পরে পরে ঘুরে বেড়াতেন । অল্প আহার, অল্প নিদ্রার তাঁর অভ্যাস ছিল । এসব আশ্চর্যজনক অভ্যাসের একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মুজাহিদসুলভ ক্রিয়াকর্ম, জনসেবা ও আত্মত্যাগ । তাঁর বুযুর্গী ও নিষ্ঠা মানুষকে মুগ্ধ করেছে । শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবীর কন্যা জয়নবের সাথে শাহ রফিউদ্দিন দেহলবীর পুত্র

আব্দুর রহমান ওরফে মুস্তাফার শুভ বিবাহ হয় । এঁদের কন্যা কুলসুমের সাথে শাহ ইসমাইল দেহলবীর শুভ বিবাহ হয় । এই বিবাহ দেন শাহ শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী । অর্থাৎ শাহ শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে নাতজামাই করেন । শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে এতই স্নেহ করতেন যে, তিনি স্বগর্বে কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করতেন আর বলতেন, "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন ।" এখানে শাহ ইসহাক দেহলবী ছিলেন শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবীর নাতি ।

বর্ণিত আছে, শাহ ইসমাইল শহীদ-এর যুগে দিল্লীর কুখ্যাত বাঈজী 'মোতির' বাড়িতে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বারবণিতা (Bargirl) বা দেহব্যাবসায়ী মহিলারা জড় হয়েছিল । মধুচক্রের আসরে বাঈজী মোতির বাড়ি সবসময় সরগরম থাকত । একদিন মোতি বাঈজীর কাণ্ডকারখানা সংবাদ পেয়ে শাহ ইসমাইল শহীদ-এর ফকির সেজে মোতি বাঈজীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন । একটি বালিকা বেরিয়ে এল । শাহ সাহেব ফকির হিসেবে পরিচয় দিলে বালিকাটি কিছু পয়সা নিয়ে এলো শাহ সাহেবকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য । তখন শাহ সাহেব বললেন, "গৃহকর্ত্রীকে খবর দাও, ফকির পয়সা নেবে না – কিছু আওয়াজ শোনাবে ।" খবর পেয়ে মোতি বাঈজী শাহ সাহেবকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল । শাহ সাহেব মধুচক্রের আসরে ঢুকে 'সুরা ইয়াসীন' এর তফসীর গাম্ভীর্যপূর্ণ মিষ্টি মধুর ওয়াজ নসীহত শুরু করলেন । শাহ সাহেবের আবেগপূর্ণ নসীহত শুনে বাঈজীখানার পরিবেশ নিমেষে পালটে গেল । বাঈজীখানার আমোদ-প্রমোদ আর হৈ হুল্লোড় ক্রন্দন ও বিলাপ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে গেল । বাঈজীরা পবিত্র

জীবন যাপনের অঙ্গীকার নিয়ে তওবা করল এবং বিবাহ করে তারা সত্য সত্যই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল । জীবনে আর কোনদিন ওরা নোংরা পথে অবতরণ করেনি । এটা ছিল শাহ সাহেবের এক আশ্চর্য কারামত ।

হজ্ব যাত্রা

আমীরুল মোমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ইংরেজী **১৮২২** খ্রীষ্টাব্দে হজ্ব সম্পাদন করেন । সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তাই তাঁর উপর হজ্ব ফরজ ছিল না । পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে তৎকালীন যুগের মানুষরা হজ্ব করতে সাহস পেতেন না । তাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন যুগের আলেম উলামারা হজ্ব ফরজ নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন । কুরআন শরীফের সুরার বাকারার **১৯৫** নং আয়াত – “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না ।” আয়াতকে ভিত্তি করে তৎকালীন যুগের আলেম উলামারা এই ফতোয়া দিয়েছিলেন । এই ভুল ফতোয়ার জন্য জেহাদ ঘোষণা করে সৈয়দ আহমদ শহীদ গরীব হওয়া সত্বেও হজ্ব সম্পাদন করেন ।

সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আব্দুল হাই, শাহ আব্দুল আজীজ ও অন্যান্য হক্কানী উলামারা ফরজ কার্য্য সম্পাদনে কোনরুপ সংকীর্ণতার স্থান বা সুযোগ রাখলেন না । তাঁরা বললেন, ‘ফরয’ ফরযই ।

কোলকাতা থেকে যাত্রা শুরু হল । সৈয়দ আহমদ শহীদ সাড়ে সাত শত মুসলমানের একটা কাফেলা নিয়ে হজ্ব সম্পাদনের জন্য রওনা হলেন । শাহ ইসমাইল শহীদের মাতা ফাতেমাও এই হজ্ব যাত্রাই অংশগ্রহণ করেন । দশখানা জাহাজ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যকটি জাহাজে একটি করে আমীর বা নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল । এই যাত্রাই একটি জাহাজের নেতা ছিলেন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) । ১৯২৪ সালে সকলেই হজ্ব ও জিয়ারত সম্পন্ন করে সকলেই দেশে ফিরে আসেন ।

<u>হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন ও জেহাদী আন্দোলনের সূচনা</u>

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদ হজ্ব যাত্রা সম্পাদন করে দেশে ফেরেন । এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, "তাঁর (সৈয়দ আহমদ শহীদ) শিক্ষার সঙ্গে বেদুইন মাযহাবের (ওহাবীদের) শিক্ষার সমতা থাকার জন্য মক্কায় থাকাকালে সৈয়দ আহমদ কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন । ওই বেদুইন মাযহাবের হাতেই এই পবিত্র শহরটি কিছুকাল আগে এতো দুর্গতি সহ্য করেছিল । এজন্য সেখানকার মুফতী সাহেব প্রকাশ্যে সৈয়দ আহমদকে অপমান করেন ও শহর থেকে বের করে দেন । এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, অতঃপর তিনি ভারতে কেবল ধর্মিয়া স্বাপ্নিক ও পৌত্তলিক কুপ্রথাগুলির সংস্কারক হিসাবেই ফিরে এলেন না, তিনি ফিরে এলেন আব্দুল ওহাবের এক গোঁড়া শাগরিদ হিসাবে । তাঁর স্বভাবে যা কিছু স্বপ্নালুতা ছিল তা দূর হয়ে এবার রুপ নিল উগ্র উন্মত্ততার ।" (The Indian Musalman)

মি. হান্টার আরো লিখেছেন, "সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরীদ রুপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । সুতরাং যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া আব্দুল ওহাব আরবে একটি বিরাট ওহাবী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সৈয়দ আহমদও অনুরুপ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া ভারতের বক্ষ হইতে ক্রুস অঙ্কিত পতাকা উৎপাটিত করিয়া হিন্দুস্থানের প্রতিটি নগর পল্লীতে ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজ কাফের নিধন যজ্ঞে মাতিয়া উঠিলেন ।" (The Indian Musalman, অনুবাদ- মাওলানা আহমদ আলী)

মি. হান্টার সাহেবের মিথ্যা ভাষনে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে । Silk Lettrer Movement প্রসঙ্গে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে 'মুজাহিদীন' শব্দের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ "সৈয়দ আহমদ শহীদ আরব সফর করে । সেখানকার কট্টর নজদী ওহাবী আন্দোলনের রঙ তাকে স্পর্শ করে । ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার সে (সৈয়দ আহমদ) হচ্ছে অন্যতম ।" 'মুহাম্মাদ ইসমাইল শহীদ দেহলবী' নামক টীকায় ব্রিটিশ গোয়েন্দার বক্তব্যঃ "ওহাবী আন্দোলনের কুখ্যাত মৌলবী ইসমাইল দেহলবী, সে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজের বাড়ি থেকে ফেরার হয়েছিল, আর সে মুজাহিদীন বসতি গড়ে তুলেছিল, অত্যন্ত এবং উগ্রপন্থি ছিল ।"

এখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা যে মিথ্যা কথা বলছেন তা তার রিপোর্ট দেখেই বোঝা যায় । কেননা সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আর শাহ ইসমাইল 'শহীদ' হয়েছেন বালাকোটের যুদ্ধে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে । অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ২৬ বছর আগে শাহ

ইসমাইল শহীদ হন । সুতরাং শাহ ইসমাইল সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'ফেরার হয়েছেন' এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রিপোর্ট ।

আর অপরদিকে হান্টার সাহেব যে লিখেছেন, "তিনি (সৈয়দ আহমদ শহীদ) ফিরে এলেন আব্দুল ওহাবের এক গোঁড়া শাগরিদ হিসাবে" এবং "সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরীদ রুপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।" সত্যের খাতিরে বলতে হয় হান্টার সাহেবের এই অভিমত সঠিক নয় । কেননা, তথাকথিত ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাব নজদী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন । একথা হান্টার সাহেব স্বীকার করেছেন । সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৫০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান । তাহলে সৈয়দ আহমদ শহীদের সহিত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর যোগাযোগ হল কোথায় যে তিনি ওহাবী নেতার হাতে মুরীদ হবেন? ঐতিহাসিক Philip K. Hitti তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করেছেন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে । তাহলেও তারিখ হিসাবে দেখা যায় সৈয়দ আহমদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৩০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান । সুতরাং হান্টার সাহেবের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের নিকট সৈয়দ আহমদ শহীদের মুরীদ হওয়ার ঘটনা নিতান্তই জাল ও বানোয়াট । এখন যদি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর কট্টর শিষ্যদের কাছে ওহাবিয়তের পাঠ গ্রহণ করে, সুতরাং উনি শিষ্যের শিষ্য । হান্টার সাহেবের ঐ বক্তব্য থেকে তাও প্রমাণিত হবে না । কারণ তিনিই এক জায়গায় লিখেছেন, "সর্বশেষ মিশরের মুহাম্মাদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ

হলেন । **১৮১২** সালে পাশার পুত্রের অধীনস্ত সেনায়ক টমাস কীথ গোলার মুখে মদিনা দখল করলেন । **১৮১৩** সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হল । আর পাঁচ বছর পরে অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড়ে বিলীন হয়ে যাবার মত কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল ।" (The Indian Musalman, Page. 52)

এখানে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সৈয়দ আহমদ শহীদের হজ্বে যাবার আগেই আরবের ওহাবীরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । তাই সৈয়দ আহমদ শহীদের ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন কার কাছে? আসলে হান্টার সাহেব সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বক্রোক্তি করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন । কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তির ঠিক থাকে না ।

মি হান্টার সাহেব তথা ব্রিটিশ লেখকের অনুকরণে ভারতের অধীকাংশ ঐতিহাসিক সৈয়দ আহমদ শহীদকে 'ওহাবী নেতা' বলেই চিহ্নিত করেছেন । এখন প্রশ্ন জাগতে পারে হান্টার সাহেব তথা ইংরেজ লেখকদের সৈয়দ আহমদ শহীদ তথা তাঁর দলবলকে 'ওহাবী' রুপে চিহ্নিত করে তাঁদের কি লাভ হয়েছিল? এতে তাঁদের স্বার্থই বা কি ছিল? উত্তর একটাই ইংরেজরা **Divide and Rule policy** নীতিতে বিশ্বাসী ছিল । এই জঘন্য নীতির অনুসরণ করেই ইংরেজরা ভারতে প্রায় দুই শত বছর রাজত্ব করেছে । তখন আরবে নজদী ওহাবী দলের বাড়াবাড়িতে শুধু আরব নয় সমগ্র মুসলিম জাহানও বিক্ষুব্ধ হয়ে উটেছিল । তখন সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁরা অনুসারীরা মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা বানচান করার জন্য মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির দরকার ছিল । তাই মি হান্টার সাহেব তথা ইংরেজরা ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে লাগলেন,

জেহাদীরা আসলে আরবের কুখ্যাত ওহাবী নেতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর দল যারা কুরআন ও সুন্নত জীবিত নাম করে হাজার হাজার আলেম-উলামাদের হত্যাকারী ও সাধারন মুসলমান যারা তাদের মাযহাব মানে না তাদের মুশরিক ও কাফের ফতোয়া প্রদানকারী । ওরা মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলার দল, যারা রাজ্য লিপ্সায় মত্ত হয়ে মক্কা ও মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে, যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরিফাইন অর্থাৎ মক্কা মদিনা এবং হারাম শরীফের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমন করে এবং তাণ্ডবলীলা চালায় । ওরা আওলিয়া এমনকি সাহাবায়ে কেরামদের কবরগুলি পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় । মাযহাব মান্যকারী মুসলমান উলামাগণকে হত্যা করে । তাদের মাল আসবাবপত্র লুটতরাজ করে এবং তাদের মাল লুণ্ঠন করাকে হালাল বলে ফতোয়া দেয় । তাই আরবের ওহাবীদের শিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের দলে সামিল হয়ে আন্দোলন করা ভারতীয় মুসলমানদের আদৌ উচিৎ নয় । এই প্রচার কার্যের জন্য ব্রিটিশরা ভারতের কিছু দুর্বলমনা ও দরিদ্র ও স্বার্থপর আলেমকে ব্যাবহার করেছিল । এমনকি সেই দুনিয়ালোভী স্বার্থপর আলেমরা ইংজেরদের প্ররোচনায় সেই জেহাদী আন্দোলনের নেতাদেরকে কাফের বলেও ফতোয়া দেয় যাতে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে জেহাদী আন্দোলনে শরীক হয়ে ব্রিটিশ বিতাড়নে তৎপর না হয়ে উঠে । জাস্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন, “জিহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সাহানাভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে । এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে ।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় লিখেছেন, " 'ওয়াহাবি' কথাটি একটি ভূল প্রয়োগ । অনেক মুসলমান এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন । আসলে বৃটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের 'ওয়াহাবী' বলে যেমন তারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলত ।" (ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-৪)

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন, "দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপি এই বৃটিশ বিরোধী জিহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল কজনই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত, কিন্তু এ কথাটি সত্য নয় । বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নাম করণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি ।" (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১১/১২)

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "ভারতবর্ষ যে অনুরুপ (ওহাবী আন্দোলন) হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই । ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা – আকাঙ্খা ছিল না, তাহা বলা যায় না । সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ

রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি – সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ।” (History of Freedom Movement. iii)

সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ও তাঁর অনুসারীরা কোনদিনই ওহাবী দলভূক্ত ছিলেন না । আসলে সৈয়দ আহমদ শহীদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার কার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন । ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী ‘তরিকা-ই-মুহাম্মাদীয়া’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন । এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার কার্য । এম. মুনিরুজ্জামান লিখেছেন, “আরবের আব্দুল ওহাব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকায় বৃটিশরা এবং এ আন্দোলনের বিরোধীরা এই ‘ওহাবী’ লেবেল এঁটে এ আন্দোলনকে জনসমক্ষে হেয় করতে চেয়েছিলেন ।” (উপমহাদেশের মুসলমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২)

জেহাদী আন্দোলনের তৎপরতা

সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন প্রথমত সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিল তা কালক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রুপান্তরিত হয় । তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী সমস্ত শিরক বিদআতকে সমূলে উচ্ছেদ করে নিষ্কলুষ সেই ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে যা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় ছিল । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইসলামের মধ্যে অনেক আগাছা প্রবেশ করেছে । সেজন্য তিনি সেই আগাছাকে মুছে ফেলার জন্য সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূচনা করেন

। এই কাজে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন তাঁর সুযোগ্য মুরীদ শাহ ইসমাইল শাহীদ দেহলবী (রহঃ) । শাহ ইসমাইল শহীদ 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবে শিরক ও বিদআতের মুণ্ডপাত করেন এবং বিদআতী পীর-ফকির-দরবেশদের মুখোশ উন্মোচনা করে ছাড়েন । ফলে বিদআতীরা উক্ত কিতাব লেখার কারণে কাফের ফতোয়া দেয় এবং 'ওহাবী' বলে গালিগালাজ করে । এছাড়াও বিদআতীরা শাহ সাহেবকে নবীর গুস্তাখ ফতোয়া দিয়ে থাকে । অথচ শাহ সাহেবের প্রতি এই অপবাদের কোন ভিত্তি নেই । শাহ সাহেব একজন নবীর নিষ্কলুষ প্রেমিক ছিলেন । এই 'তাকবিয়াতুল ঈমান' এমন এক কিতাব যা পড়ে তিন লক্ষ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)ও উক্ত কিতাব পড়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন । শাহ সাহেব আর একটি কিতাব লেখেন 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামে । আসলে এই কিতাবটি সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর বাণী সংকলন বা মালফুযাত । এই কিতাবটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত । যার প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় সংকলন করেছেন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সংকলন করেছেন আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর জামাতা আব্দুল হাই বুড্ডানবী (রহঃ) ।

এইসব কিতাবের দ্বারা সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁর অনুচরেরা ইসলামের আগাছা পরিস্কার করে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন ।

সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি সৈয়দ সাহেব এ দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে মনোনিবেশ করেন । এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার সাহেব লিখেছেন, "তিনি (সৈয়দ আহমদ) দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর একজন

মশহুর আলেমের (শাহ আব্দুল আজীজের) নিকট শরীয়তি শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন । তিন বৎসর সেখানে শগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যেসব অনাচার বা বিদআত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন । তাঁর প্রথম কর্মব্যাস্ততা ছিল রোহিলাদের বংশধ্বরদের নিয়ে, যাদের নির্মূল করতে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বেতনভূক বাহিনী ধার দিয়েছিলাম এবং প্রসঙ্গটা ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনে একটা অনপেয় কলঙ্ক হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে । তাদের উত্তর পুরুষেরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমাদের উপর অশেষ প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং এখনও বিদ্রোহী বসতির সবচেয়ে সাহসী অস্ত্রধারী হচ্ছে তারাই ।” (The Indian Musalmans, Page-4)

হান্টার সাহেবের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁর পীর শাহ আব্দুল আজীজের নিকট থেকে শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শিক্ষা করেন এবং এর পাশাপাশি ইংরেজ বিরোধীতায় তৎপর হয়ে উঠেন । অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ সাহেব একদিকে শিরক-বিদআত বিরোধী ও ইংরেজ বিদ্বেষী দুটোই ।

হান্টার সাহেব আরও লিখেছেন, “বিশেষতঃ ইমাম সাহেব ১৮২০-২২ সালে কোলকাতা যাওয়ার পথে গঙ্গানদীর উপত্যকায় অবস্থিত যে সব বড় শহরে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন, সে সব শহরে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে লাগল । এভাবে আমাদের

রাজ্য থেকে অজস্র ধারায় অসন্তুষ্টের দল জিহাদী বসতিতে জামায়েত হতে লাগল ।” (The Indian Musalmans, Page-13)

হান্টার সাহেবের এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে সৈয়দ আহমদ সাহেব অনেক আগে থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে আসছেন । তিনি কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী বলেই হান্টার সাহেব সৈয়দ আহমদ সাহেবকে গালিগালাজ দিয়েছেন এবং দস্যু দরবেশ বলে ব্যাঙ্গ করেছেন ।

মাওলানা গোলাম রাসুল মিহর লিখেছেন, “সৈয়দ সাহেব ও অন্যান্য মুসলমান শাসক ব্যাতিত শাহ মাহমুদ (হিরাতের শাসক)কেও দিয়েছিলেন জিহাদের দাওয়াত । তাতে বলা হয়, জিহাদ কায়েম করা এবং বিদ্রোহ ও গোলযোগ দুরীভূত করা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে আল্লাহ তা’লার অত্যান্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ হুকুম বলে গণ্য করা হয়েছে । বিশেষ করে সেই যামানায় তা আরো সত্য, যখন কাফির ও দুষ্কৃতিকারীদের অনিষ্ট এমন রুপ পরিগ্রহ করে যাতে, উদ্ধত ও বিদ্রোহীদের হাতে দ্বীনি কার্যকলাপ বিকৃত হয়ে যেতে থাকে, ইসলামী রাজা – বাদশাহদের শাসনাধীন এলাকাসমূহ পতনের দিকে নেমে যেতে থাকে এবং এই গুরুতর অনিষ্ট ভারত (হিন্দ), সিন্ধু ও খোরাসানের ভূখণ্ড সমূহে প্রসার লাভ করেছে । এহেন অবস্থায় উদ্ধত কাফিরদের অনিষ্ট উপেক্ষা করা এবং অনিষ্টকারী বিদ্রোহীদের কানমলা সহ্য করে যাওয়া কঠিন ও গুরুতর গুনাহ । এরই জন্য খোদার দরগাহ এ বান্দা স্বদেশ পরিত্যাগ করে হিন্দ, সিন্ধু ও খোরাসান সফর করেছে এবং তথাকার মুমিন ও মুসলমানদেরকে জিহাদের আমন্ত্রন জানিয়েছে ।

গোয়ালিয়রের হিন্দুরাওকে তিনি এক পত্রে বলেন, 'যে বিদেশীরা বহু দূর থেকে আগত, তারা এখানে রাজত্ব কায়েম করেছে । যে বনিকরা পণ্য বিক্রয় করতো, তারা কায়েম করেছে সালতানাত (রাজত্ব) । বড় বড় আমীরদের ইমারত এবং রইসদের রিয়াসত মাটিতে মিশে গেছে । যারা ছিল রিয়াসত এবং সিয়াসত (রাজনীতি)র মালিক, তারা আজ অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে কোন স্থানে আত্মগোপন করেছে । অবশেষে ফকির ও মিসকিনদের ভিতর থেকে স্বল্প সংখ্যক লোক সাহসে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে । দুর্বল মানষদের এই দলটি কেবল খোদার দ্বীনের খিদমতের লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে । তারা দুনিয়াদার বা পদমর্যাদার দাবীদার নয় । হিন্দুস্থানের ময়দান যখন বিদেশী ও দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং এই দুর্বলদের প্রচেষ্টার তীর লক্ষ্যভেদ করবে, তখন ভবিষ্যতের জন্য রিয়াসত এবং সিয়াসতের ভার যোগ্য লোকেদের অপরই অর্পিত হবে ।

ভেবে দেখুন, যে দূরাগত বিদেশী ব্যাবসায় করতে এসে সালতানাতের (রাজত্বের) মালিক হয়ে বসেছিল, তারা কারা? স্পষ্টতই তারা ছিল ইংরেজ এবং তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈয়দ সাহেব নিজে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলেন ।

শাহজাদা কামরানকে সৈয়দ সাহেব যে পত্র লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষঃ- 'সবাইকে আমি জিহাদের দাওয়াত জানিয়েছি । আমার ইউসুফ যাই এলাকায় অবস্থানকালে আফরিদী খটক, মোহমন্দ, খলীল উপজাতি, নংগরহাব, সোয়াত, বুনির ও

পাখালির বাসিন্দারা এবং কাশ্মির প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ আমার সহচার্যে আসে । আমার উদ্দেশ্য হুকুমত নয়, আমার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দান ও সুন্নত নববীর পুনরুজ্জীবন । এছাড়া আমি চাই ইসলামী এলাকা সমূহের দুষ্কৃতিকারী কাফেরদের হাত থেকে মুক্তিবিধান । যখন সে এলাকা মুশরিক ও মুনাফিকদের অধিকার – মুক্ত হবে, তখন তা যোগ্য লোদের হস্তে ন্যস্ত করা হবে । ...... তারপর আমি মুজাহিদদের সাহায্যে হিন্দুস্তানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করব, যাতে সেখানে কাফির ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের খতম করে দেওয়া যায় । আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে জিহাদ, খোরাসানে বসতি স্থাপন নয় ।

সৈয়দ আহমদ শহীদের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমি ব্যাখ্যা করেছি, সে সম্পর্কে এর চাইতে স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর প্রমাণ আর কি হতে পারে?" (মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২/৫)

এখানে মাওলানা গোলাম রাসুল মিহর সাহেবের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে সৈয়দ আহমদ শহীদের মূল আন্দোলন ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে । মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া লিখেছেন, "সৈয়দ সাহেবের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ভারত থেকে ইংরেজদের আধিপত্য উচ্ছেদসাধন, যার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল, তাই তিনি হিন্দুদেরকেও আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান । তিনি স্পষ্ট বলেছেন, তাঁর একক উদ্দেশ্য দেশ থেকে বিদেশীদের প্রভাব খতম করা । এরপর হুকুমাত কাদের হবে, সে ব্যাপারে তাঁর মাথাব্যাথা নেই, হিন্দু মুসলমান বা উভয়েই, যারা যোগ্য বিবেচিত হবে দেশ শাসন করবে ।" (শানদার মাযি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৩/১৯৫)

সৈয়দ আহমদ চেয়েছিলেন তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পাঞ্জাবের শাসক রঞ্জিত সিংহ সহযোগিতা করে । কিন্তু রঞ্জিত সিং তা না করে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন । শুধু তাই নয় রঞ্জিত সিং সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং মুসলমানদের জান মালের শত্রু হয়ে যান । সৈয়দ আহমদ সাহেব একবার সীমান্তের পঞ্জতরে উলামা ও পাঠানদের সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন, "আমি খেয়াল করেছিলুম, হিন্দুস্তানে কোন নিরাপদ স্থানে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করব । কিন্তু বিরাট এই দেশে আমি কোন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেলুম না । কত লোক প্রস্তাব দিয়েছে, এই দেশে জিহাদ করো । কিন্তু আমার মনঃপুত হয়নি । কেননা জিহাদ সুন্নত অনুসারে হওয়া চাই, অহেতুক হাঙ্গামা বাধানো উচিত নয় । তোমাদের দেশী ভাই উপস্থিত ছিল । ওরা প্রস্তাব দিল, 'আমাদের দেশ এদিক দিয়ে খুবই উপযুক্ত । আপনি ঐখানে গিয়ে কোথাও কেন্দ্র গড়ে তুলুন; লক্ষাধিক মুসলমান জান – মাল দিয়ে আপনার সাহায্য করবে । বিশেষতঃ লাহোরের শাসনকর্তা রঞ্জিত সিংহ মুসলিমদেরকে অতিষ্ঠ করছে, কষ্ট দিচ্ছে, বেইজ্জত করছে । ওদের সেনাবাহিনী মসজিদে অগ্নিসংযোগ করছে, ফসল নষ্ট করছে । মাল – সামান ওরা লুটপাট করছে । নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে ওদের দেশ পাঞ্জাবে বেচে দিচ্ছে । মসজিদে আজানের অনুমতি নেই, মসজিদে ঘোড়া বাঁধছে । গরু জবেহ তো দুরের কথা, গরু জবেহর নাম শুনলে মুসলিমদের মেরে ফেলছে । আমি এসব কথা শুনে ভাবলুম, ওরা ঠিক বলছে । ভারত থেকে হিজরত করে ঐ দেশে অবস্থান করব, বেদ্বীনদের সঙ্গে জিহাদ করে যুলম – অত্যাচারের অবসান ঘটাব ।" (সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৬/৪২৭)

সৈয়দ আহমদের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তিনি সাময়িকভাবে ব্রিটিশ বিরোধীতার মোড় পাঞ্জাবের শিখ নেতা রঞ্জিত সিংহের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন প্রথমে রঞ্জিত সিংহের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের নিস্কৃতি দেওয়া যাক তারপর ব্রিটিশদের উৎখাত করার তৎপরতা গ্রহণ করা যাবে ।

বালাকোটের সেই মর্মান্তিক মুহূর্ত

শিখ ও মুসলিম সংঘর্ষ সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছেন, “পাঠান আদি জাতিরা উন্মত্ত আবেগে তাঁর (সৈয়দ আহমদ শহীদ) আহ্বানে সাড়া দিল । এই হাঙ্গামাপ্রিয় অতি সংস্কারাপন্ন মুসলমানরা বড় খুশি হলো এই ভেবে যে, দ্বীনের নামে হিদু (শিখ) প্রতিবেশীদেরকে লুণ্ঠন করার একটা সুযোগ মিলে গেল । আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় আক্রমণ প্রবল শিখরা তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা । ইমাম সাহেব (সৈয়দ আহমদ শহীদ) তাঁর ধর্মান্ধ সীমান্তবাসী মুসলমানদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জিহাদে যারা জয়ী হয়ে ফিরে আসবে, তারা বেশুমার মাল-ই-গনিমত আনবে, আর যারা নিহত হবে, তারা শহীহী মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতে উপস্থিত হবে । তিনি কান্দাহার ও কাবুলের মধ্য দিয়ে সফর করে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং আদি জাতি গুলিকে কৌশলে এক জোট করে শক্তিকে সুদৃঢ় করলেন ।”

“১৮২৭ সালে ইমাম সাহেব (সৈয়দ আহমদ শহীদ) শিখদের এক গড়বন্দী ছাউনির বিরুদ্ধে নিজের অনুচরদের চালনা করেন । কিন্তু বহু প্রাণক্ষয় স্বীকার করে

তাঁকে ফিরে আসতে হয় । সমতলভূমির শিখ জেনারেল অবশ্য তাঁদের তাড়া করে সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সাহসী হননি । মুজাহিদ সৈন্যরা সিন্ধুনদ পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিল এবং গেরিলা যুদ্ধে যেরকম সাফল্য দেখাল যে, শিখনায়ক অনন্যোপায় হয়ে যারা লুণ্ঠনকার্য্যে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছিল, সেই আদি জাতির মিত্রতা ক্রয় করতে বাধ্য হলেন । ১৮২৯ সালে সমতলবাসীরা তাদের সীমান্তের রাজধানী পেশোয়ারের নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো এবং তাদের শাসক হীন ষড়যন্ত্রে ইমাম সাহেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান করতে চাইলো । এই গুজব ছড়িয়ে পড়া মাত্র পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমানদের জিদ আগুনের মত জ্বলে উঠল । তারা সমতলভূমিতে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে এসে শিখ সৈন্যদের একজোগে হত্যা করলো এবং তাদের জেলারেলকেও মারাত্মকভাবে জখম করলো । এরপর যুবরাজ শেরসিংহ এবং তাদের জেনারেল ভেনতুরা বিশাল বাহিনী নিয়ে কোন রকমে পেশোয়ার রক্ষা করেন ।”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে পেশোয়ারের পতন হয় । হান্টার সাহেব লিখেছেন, “অনন্যোপায় হয়ে শিখনেতা রঞ্জিত সিং খুব সুদক্ষ সেনানায়কদের অধীন এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন । ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার (জেনারেল আলার্ড ও হরিসিং নালওয়ার অধীনস্থ শিখ বাহিনীর নিকট) পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে । আর সেই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয় । এই হলো ইমাম সাহেবের কর্মজীবনের চরমোন্নতির মুহূর্ত । তিনি নিজেকে খলিফা হিসাবে প্রচার করলেন এবং

'সত্যাশ্রয়ী আহমদ, দ্বীনের রক্ষক, তার ঝকঝকে তরবারি কাফেরকূলের নাশ করে' এই বাণী নিয়ে নিজ নামে তঙ্কা জারি করলেন । কিন্তু পেশোয়ারের পতনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো, তার দরুন রঞ্জিত সিংহও তাঁর অতুলনীয় কূটনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন । এই অতি চতুর শিখ নায়ক অতঃপর ছোট ছোট মুসলমান আমীরকে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন । ফলে ইমাম সাহেব মুক্তি মূল্য দিয়ে শহরটি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । অন্তর্বিরোধের দরুন, তাঁর অনুগামীদের উপর কর্তৃত্বও শিথিল হয়ে গেল ।" (The Indian Musalmans, Page-6/9)

কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি । প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার সফলতা পেলেও সৈয়দ আহমদ শহীদ ৫ই মে এবং তাঁর শিষ্য শাহ ইসমাইল শহীদ ৯ই মে শহীদ হন । সৈয়দ আহমদের মস্তক দেহ থেকে খণ্ডিত করা হয় । প্রায় সাড়ে চার শত সৈন্য এই যুদ্ধে শহীদ হন । যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা বেলায়ত আলী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী প্রমুখ ।

এখানে শাহ ইসমাইল শহীদের ব্যাপারে একটি অলৌকিক ঘটনা উল্লিখিত আছে । শাহ ইসমাইল শহীদের কাছে একবার এক শত্রু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিন্দা করলে শাহ ইসমাইল শপথ করে বলেন ওকে নিহত না করা পর্যন্ত আমি কখনো মরবো না । আশ্চর্য্যের বিষয় ভীষন যুদ্ধের সময় শত্রুটি শাহ ইসমাইলের উপর আঘাত হানল । শাহ ইসমাইল মস্তক কর্তিক অবস্থায় হাত ধৃত তরবারি চালিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে নিহত করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-১০৮, আজিবুল হক)

শহীদ হওয়ার পর সৈয়দ আহমদ শহীদের লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায় নি । তবে এ কথা সত্য যে তিনি দেশবাসীকে রক্তমাখা মাথা উপহার দিয়ে গেছেন যা থেকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তাঁর অগ্নিমন্ত্রে অদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ।

আন্দোলনের পর্যালোচনা

সৈয়দ আহমদ শহীদের এই আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আন্দোলন । ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "Its may be called first war of Indipendence in India." (History of freedom Movement, R.C. Majumder)

রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও লিখেছেন, "ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্খা ছিল না তাহা বলা যায় না । সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসেবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ।" (আব্দুল মওদুদঃ ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

হান্টার সাহেবও সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন, "The Mussalmans of India are and have been for many years a source of chronic to the British power of India." (The Indian musalman)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় তাঁর Freedom Movement and Indian Muslim গ্রন্থে এই আন্দোলনকে “Most remarkable anti-British of 19th century panic of British, chief headache of British antherities” প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন ।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “শিখরা যদিও স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করে তবু তাদের স্বাভাবিক স্থান হিন্দু মেজাজেরই উদার পরিসরে এবং হিন্দু ধর্মের অঙ্গ স্বরুপ হয়েও শিখ সম্প্রদায়ের অন্তঃস্থলে সংগ্রামী মনোভাবের প্রকটতা লক্ষ্যণীয় । আর এই মনোভাবের দরুনই সংগ্রামী মুসলিমদের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল সংগত আর্থাৎ এখানেই ওয়াহাবীরা পেয়েছে নির্বিরোধ তথা নিরস্ত্র হিন্দুদের বাদ দিয়ে সশস্ত্র শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা । সে যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতেই অবসিত হয়নি, আহমদের পরে পাটনার খলিফাময় বলে পরিচিত ওয়ালিয়াৎ আলী ও ইনায়াত আলীর নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা একযোগে ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং মিত্তানাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় । ....ওয়াহাবী তৎপরতার প্রেরণাতেই বিহারে অল-ই-হাদিস এবং বাংলায় ফরাজী আন্দোলন গড়ে উঠে এবং যেটা লক্ষ্যণীয় সেইটি এই যে, দুটির কোনটিই দৃঢ় অর্থে হিন্দু – বিরোধী আন্দোলন ছিল না, দুটিই ছিল মুসলিম নেতৃত্বে চালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ।” (ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৪৯)

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "ওহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয় । এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের বৈদেশিক শাসনের (ব্রিটিশ) উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারবাসীর বিদ্রোহ । কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যানেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মাধ্য দিয়ে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ।" (মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃষ্ঠা-৯৯)

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে তাঁর 'বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, "ওয়াহাবীরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় । আর এই ওয়াহাবী আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায় ।"

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন, "ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিশ্বাসীর চোখে দেখিত না । রাজত্ব হারাইয়া মুসলমানগণই প্রথম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল । এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ওহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য এবং প্রসঙ্গত এখানে বলা যাইতে পারে যে মুসলিমদের আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে যে জাতিয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহাকে অবলুপ্ত করিবার জন্যই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি ।" (পনেরই আগস্ট, পৃষ্ঠা-১০২)

অধ্যাপক পভাতাংশু মাইতি সৈয়দ আহমদের এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন, “ইংরাজ বা বিদেশীদের বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলামে পরিণত করার আহ্বান তিনি দেন । তিনি বলেন যে, বণিক ইংরেজরা ভারতের সম্পদ শোষণ করে দেশকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে । এদের বিতাড়িত না করলে ভারতবাসীর রক্ষা নেই ।” (আধুনিক ভারত ১৫শ সং, পৃষ্ঠা – ১০৪)

ঐতিহাসিক ডাঃ কল্যান চৌধুরী লিখেছেন, “ঐ সময় মুজাহিদীন বা তরিকাই-মুহাম্মদীয়া নামে ধর্মযোদ্ধারা ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ।” (আধুনিক ভারতের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা – ৯৬/৯৭)

ঐতিহাসিক অতুল রায় লিখেছেন, “তিনি (সৈয়দ আহমদ) সাহায্যের জন্য মারাঠা – অধিনায়ক রাজা হিন্দুরাও এর কাছে পত্র লেখেন । সৈয়দ আহমদ উত্তর – পশ্চিম সীমান্তে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করলে প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখরাজ্যের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে ।” (ভারতের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা – ২৬৫)

সৈয়দ আহমদ শহীদের এই আন্দোলন কালক্রমে গণ-আন্দোলনের রুপ নিয়েছিল । এই আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ধর্মের সাথে জড়িত থাকায় তৎকালীন শাসক ও জমিদার গোষ্ঠী খুব সহজেই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে প্রধান করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মের সাথে জড়িত থাকলেও এই আন্দোলন ক্রমশঃ গণবিদ্রোহে

পরিণত হয়েছিল । আমিনুল ইসলামের কথায়, “সৈয়দ আহমদের দূরদর্শীনীতির ফলে এই মতবাদ কেবলমাত্র তত্ত্বের নীরস কচকচানির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি । দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের সাথে সাথে ওয়াহাবী আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রুপ নিল ।...... অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলিমদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করেছিল । এ ভাবে বিভিন্ন তথ্য হতে দেখা যায়, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রথমে ধর্মের নামে শুরু হলেও এটা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জমিদার – নীলকর – মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল ।” (বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান চর্চা, পৃষ্ঠা-৯২/৯৩)

অনেকে এই আন্দোলনকে হিন্দুবিরোধী বললেই এই আন্দোলন কোনদিন হিন্দুবিরোধী ছিল না । কারণ বহু হিন্দু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে, এই আন্দোলনের (ওহাবী) সমর্থন করার জন্য বহু হিন্দুকে আটক করা হয়েছিল । বহু হিন্দু এই আন্দোলনে সংগ্রামী তহবিলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । তাই এই আন্দোলন কোনদিন হিন্দুবিরোধী ছিল না এবং এই আন্দোলনের মুজাহিদরা হিন্দুদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়নি । এই আন্দোলনের হিন্দু-মুসলমানের সক্রিয় সমর্থন ছিল বলেই মুজাহিদরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালাতে পেরেছিল । অমলেন্দু দে লিখেছেন, “এমন দক্ষতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় যে, ...কোথাও ওহাবীদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়নি । হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের সাহানুভূতি

প্রদর্শন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে । এই কারণে এই আন্দোলনের সময় কিছু সংখ্যক হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয় । যদি ফরাজী – ওয়াহাবী আন্দোলনের চরিত্র প্রকটভাবে সাম্প্রদায়িক হত তাহলে দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের উত্তর – পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী করিডর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না, আর নীল বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্য গ্রাম বাংলায় সম্ভবপর হত না । শ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমান সমাজের সাহানুভূতি যেমন এই ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি ছিল তেমনি হিন্দুরাও সম্প্রদায়গতভাবে অংশগ্রহণ না করলেও এই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে সক্রিয়ভাবে বিরোধীতা করতে অগ্রসর হয়নি ।” (বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৯৪)

বহু সংখ্যক মুসলমান ও কিছু সংখ্যক হিন্দু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনীরা পরাস্ত হয় । কারণ বহু সংখ্যক মুসলমান এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও অনেক মুসলমান এমন ছিল যারা এই আন্দোলনের সমর্থক ছিল না । কেননা এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সমাজ সংস্কারক হিসাবে । এই আন্দোলনের কর্ণধাররা চেয়েছিলেন দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে যে অনাচার (শিরক-বিদআত) প্রবেশ করেছে তা দূর করতে । কিন্তু সমাজের অনাচার ও শিরক বিদআতে আচ্ছন্ন গোষ্ঠীরা কোনদিনই চাননি সমাজ সংস্কার হোক এবং মুসলিম সমাজ শিরক-বিদআতের অন্ধকার থেকে ফিরে আসুক । এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কবরপুজারী সম্প্রদায় । তারা চেয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে সমাজে যে অনাচার চলছে তা চলুক । তাদের কবরপুজার লাভজনক ব্যাবসা যাতে বন্ধ না হয় । এই ধারণার বশবর্তী

হয়ে তারা এই আন্দোলনের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু করে দেন এবং শাহ ইসমাইল শহীদের লেখা 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কে কেন্দ্র করে সমাজে বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেয় । শাহ ইসমাইল শহীদকে তারা নবীর গুস্তাখ ফতোয়া দিয়ে শাহ সাহেবের নামে বিভিন্ন অপপ্রচার শুরু করে । এমনকি তারা শাহ সাহেবকে কাফের বলেও ফতোয়া দেয় । ফলে বহু সংখ্যক মুসলমান কবরপুজারী ভণ্ডদের প্রতারণায় ফেঁসে গিয়ে এই আন্দোলনে শরিক হয়নি ।

অপরদিকে সীমান্ত সংগ্রামে এই আন্দোলনের ব্যার্থতার কারণ হিসাবে বলা যায় উপজাতিদের মধ্যে আত্মকলহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা । সীমান্ত এলাকায় অধিবাসীরা সাধারণত স্বাধীনচেতা ও রণপটু । সৈয়দ আহমদ অনেক বিবেচনার পর সংগ্রামের কেন্দ্রকে বেছে নিয়েছিলেন । কিন্তু তাঁরা প্রত্যাশা ফলপ্রসু হয়নি ।

এই সংগ্রামের ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়েছিল দেশের বাইরে । তাই দেশের অভ্যন্তরে সেনা ও রসদ থাকার জন্য এই আন্দোলনের বিপর্যয় হয়েছিল ।

এই আন্দোলনের বিপর্যয়ে সব থেকে বড় কারণ ছিল উন্নত সমরাস্ত্রের অভাব । এই আন্দোলনের মুজাহিদদের যে অস্ত্র ছিল তা গাদা বন্দুক আর বাঁশের লাঠি । কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে ছিল এনফিল্ড রাইফেল । মুজাহিদরা এই গুরুতর সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই অধ্যাপক কায়েমুদ্দিন আহমদ দুঃখ করে লিখেছেন, "The tragedy of the situation lay in the fact that the significance of this

crucial factor, demonstrated again and again from the 18th century on words, was never fully realized either by the leaders of the Movement of 1857 or by the Wahabis. When the significance of a factior itself is not realised the question of taking remedial measures against it, naturally, does not arise. (Page-342)

এই আন্দোলনের বিপর্যয়ের আর একটি বড় কারণ ছিল অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের উদাসীনতা । হিন্দুরা মোঘল যুগে যেমন আরবী, ফারসী ভাষা রপ্ত করে পায়জামা, সেরওয়ানী পরে মুসলমান শাসনকালে মুসলমানদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছিলেন অনুরুপ ব্রিটিশ শাসনকালে তাঁরা ইংরেজী ভাষা আয়ত্ব করে কোট-পেন্টালুন ধরতে দ্বিধাবোধ করেন নি । তাঁরা ঠিক সময়ের সাথে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন । বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেক হিন্দুই চেয়েছিলেন মুসলমানদের পরিবর্তে ব্রিটিশরাই রাজা হোক এবং তাঁরা ব্রিটিশের জয়গান গেয়েছিলেন । যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইংরাজী রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে ও নিষ্কন্টক ধর্মাচরণ করিবে ।" তিনি আরও লিখেন, মুসলমানদের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না । বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল । হিন্দু সিপাহী ইংরাজের হইয়া লড়িল । হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল । কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই; আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে (হিন্দু) অত্যন্ত প্রভূভক্ত ।" বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন, "স্বাধীনতা স্বদেশী কথা নহে; বিলাতী আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ,...ইহার এমন তাৎপর্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে ।"

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতির মনের কথা অন্যত্র লিখেছেন, “অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাঁহারা এইরুপ বলিবেন তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি । আমরা পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন থাকিব – সে মীমাংসা আমাদের প্রয়োজন নাই ।” (ভারত কলঙ্ক – ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা)

বঙ্কিমচন্দের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় হিন্দুরা মুসলমান শাসনকাল থেকেই নিজেদের পরাধীন বলে মনে করতেন এবং পরাধীনতাকে তাঁরা স্বাচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন । তাই শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অযথা হাঙ্গামা করে নিজেদের উপর অনাকাঙ্খিত বিপদ টেনে আনতে চান নি । তাই তাঁরা প্রথম দিকে স্বাধীনতার আন্দোলনে তেমন কোন আগ্রহ তো দেখান নি বরং ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হয়েছিলেন ।

হান্টার সাহেব লিখেছেন, “ভারতীয় মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির জন্য চিরন্তন বিপদ । কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । শিষ্ট ভাবাপন্ন হিন্দুরা যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে, সেখানে মুসলমানেরা যেগুলিকে তাদের ভীষন অবিচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে ।” (Indian Musalman, Page – 3)

হিন্দুরা ব্রিটিশদের রাজত্বকে রামরাজ্য বলে মনে করতেন । যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,

চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়
ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয় ।।
এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়
শাস্ত্রমতে এই রাজ্য রামরাজ্য কয় ।।

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয় ।
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ।।

জয় হোক ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয় ।
রাজ অনুগত যারা, তাদের কি ভয় !"

(দিল্লীর যুদ্ধ, গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা – ১৯১/৩২০)

তিনি আরও লিখেছেন,

"যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা"
"গরু জরু (স্ত্রী) লবে কেড়ে চাঁপদেড়ে যত নেড়ে
এইবেলা সামাল সামাল ।"

তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিভরে লিখেছেন,

“এই ভারত কিসে রক্ষা হবে
ভেব না মা সে ভাবনা ।
সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা কেটে
আমরা ধরে দেব ‘নানা’ ।”

(কানপুরের যুদ্ধ, পৃষ্ঠা – **১৯০**)

তাহলে বুঝাই যাছে যে হিন্দুরা পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন । সেজন্য তাঁরা সৈয়দ আহমদের বাহিনীকে সমর্থন করতে পারেন নি । এটা সৈয়দ আহদের আন্দোলনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যায় ।

শিখরাও সৈয়দ আহমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে । এই প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া (রহঃ) লিখেছেন, “কতই না ভাল হত, যদি শিখ ইংরেজের স্বরুপ উপলব্ধি করত এবং সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিজ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হত! কিন্তু ওঁরা সৈয়দ সাহেবের পতন ঘটিয়ে **১০/১৫** বছরের মধ্যে শিখ হুকুমতেরই মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল ।” (শানদার মাযি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৯)

তবে এই আন্দোলন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মুজাহিদ বাহনী পরাস্ত হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগ্নিযুগের বিপ্লবী-

মুজাহিদরা অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । তাঁরা সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের বীরত্ব দেখেই প্রেরণা লাভ করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েগিয়েছিলেন । যার ফলাফল হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করি ।

বালাকোটের পরবর্তী পর্যায়

সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ বালাকোটের প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর তাঁর অনুসারীরা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন । তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ইনায়েত আলী ছিলেন বাংলাদেশে ও বিলায়েত আলী ছিলেন দাক্ষিণাত্য ।

সৈয়দ আহমদের খলিফারা বালাকোটের লুণ্ঠিত পতাকাকে আবার উচ্চে তুলে ধরেন এবং মুজাহিদ বাহিনীরা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়েন । পাটনাতেও সৈয়দ সাহেবের খলিফারা নতুন উদ্যম নিয়ে এই আন্দোলনের তৎপরতা শুরু করেন । এই উদ্যমকে হান্টার সাহেব প্রশংসা করে লিখেছেন, “Again the fanatic cause seemed ruined. But the Missionary zeal of the Patna caliphs and the immense pecuniary resources at their command once more raised the sacred banner from the dust. They covered India with their emissaries and brought about one of the greatest religious

revivals that has ever taken place.” (Wahabism in India, Calcutta C.C.I & C II সংখ্যা, 1870)

এইভাবে এই আন্দোলনের গতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল । এই আন্দোলনের ধারা সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল । হান্টার সাহেব লিখেছেন, “তাহারা এরুপ নিপুণতা সহকারে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন যে যে সমস্ত লোক একবার তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা জেহাদে যোগদানপূর্বক প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য পাগলপারা হইয়া উঠিয়াছে । এইভাবে প্রতি জেলার জন্য এক একজন করিয়া দায়িত্বপূর্ণ প্রচারক নিযুক্ত ছিল । এবং তাহারা জনসাধারণের মধ্য দিয়া ধর্মোন্মাদনা জাগাইয়া জেহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত । এই সকল প্রচারক আপনাপন জীবনের সুখ আরামের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বার্থলেশশূন্য অবস্থায় বিরামহীন গতিতে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন । পাটনায় কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতি হইতে তাঁহাদিগকে সর্বদা সর্বপ্রকারে সাহয্য ও উপদেশ যোগান হইতেছিল । ষড়যন্ত্রকারীগণ বাংলায় কিরুপ বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করিয়াছিল সে কথা লইয়া পরে আলোচনা করিব । এই জেহাদী প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ফলে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণও জেহাদের ব্যয় নির্বাহার্থ আপনাপন অঙ্গ হইতে হীরা জওহর জড়িত মূল্যবান গহনা খুলিয়া দিবার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন । উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাহারা অসংখ্য রংরুট সংগ্রহ করিয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহারা প্রতিটি মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে উপনীত হইয়া আপামর জনসাধারণকে জেহাদের নামে উন্মত্ত

ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন । যদিও বাঙালী মুসলমানের অফুরন্ত সাহয্য ও অসীম ত্যাগ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল । তবুও অন্যান্য প্রদেশবাসী মুসলমানগণও অনেকদিন পর্যন্ত একইভাবে আন্দোলনকে শক্তি জোগাইয়াছে । পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, ‘এই সমস্ত প্রচারকবৃন্দ আমাদের জেলাসমূহের ঘন বসতি সমন্বিত শহর ও গ্রামসমূহে গিয়া সরকারী কর্মচারীদের চোখের উপর বিদ্রোহের বিষ ছড়াইয়া এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে (১৮৬৫ সালের পাটনার সরকারী দস্তাবেজ) ।” (The Indian Musalmans)

বাংলার বীর সন্তান তিতুমীর

তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী । তাঁর পিতা নাম মীর হাসান আলী আর মায়ের নাম ছিল আবেদা রোকাইয়া খাতুন । তিতুমীর কুরআনের হাফিয ও মাওলানা ছিলেন । তিনি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের চব্বিস পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ১৮২২ সালেন জেহাদী (ওহাবী) আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর হাতে কোলকাতায় মুরীদ হন এবং জেহাদী আন্দোলনের আগামী পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন । মক্কায় থাকাকালীন তিনি সৈয়দ আহমদের কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন । ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন ।

তিতুমীরের আন্দোলন ধর্মীয় ইস্যুতে সূচনা হলেও পরবর্তীতে তাঁর আন্দোলন জমিদার শ্রেণীর সামন্ত সম্প্রদায়, নীলকর অত্যাচারী শোষক ও ব্রিটিশ সরকারের

নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই আন্দোলন এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের রুপ ধারণ করে । সৈয়দ আহমদের আন্দোলন ছিল সীমান্ত প্রদেশে আর তিতুমীরের আন্দোলন ছিল অবিভক্ত বাংলায় । আব্দুল গফুর চৌধুরী লিখেছেন, “ইংরেজের বিরুদ্ধে তখন প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা না করলেও যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য প্রচুর নওজোয়ানকে তিনি দলে দলে পাঠিয়ে দিতেন, সঙ্গে প্রচুর টাকা পয়সা পাঠাবারও ব্যবস্থা করতেন । সৈয়দ নিসার আলীর একটা বড় সম্বল ছিল, তা হচ্ছে অগ্নিবর্ষক সৃজনশীল বক্তৃতা করার ক্ষমতা । নিসার আলী নিজেও একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ও ব্যায়ামবীরও ছিলেন । তিনি তাঁর শিষ্যদের নিজের সশস্ত্র ট্রেনিং দিতেন । (শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৩০/৩১)

তিতুমীরের বক্তৃতার ক্ষমতা এমন ছিল যে তিনি আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন । তিতুমীর দেখেছিলেন, বাংলাদেশে জমিদারতন্ত্র বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, আর সেই জমিদারেরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের । ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুগত এই হিন্দু জমিদারদের প্রবল দাপট ছিল । তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন, হিন্দু জমিদাররা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার কাছ থেকে জোর করে পূজোর চাঁদা, বেআইনী কর, আবওয়াব ইত্যাদী আদায় করে । ইংরেজ নীলকররা হিন্দু জমিদারদের বন্ধু এবং তাই নীলকরদের সাথে সাথে হিন্দু জমিদারদের দ্বারাও বাংলাদেশের কৃষক সমাজ নির্যাতিত ও নিপীড়িত ।

তিতুমীর তা সহ্য করতে না পেরে নীলকর কুঠিয়াল ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন । তিনি জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন । তিতুমীরের এই আন্দোলনে বাংলার নীলকর ও জমিদার গোষ্ঠী প্রমাদ গুণলেন । এই জমিদারদের মধ্যে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । সমস্ত জমিদারেরা তিতুমীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন যে কোনভাবেই তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে হবে । অবশেষে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য পাঁচদফা ফরমান জারি করলেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধানের উপর হস্তক্ষেপ করলেন । তিতুমীর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে ইসলামের বিধিবিধানের উপর হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার করার জন্য একটি পত্র দিলেন । সেই পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম । কেননা এই পত্রে তিতুমীরের উদার মানসিকতার পরিচয় মেলে । পত্রটি ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে তাঁর 'বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তিতুমীরের সেই পত্রটি হলঃ

"ব জনাব জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়,
সমীপেষু, পুঁড়ার জমিদার বাড়ি,
মহাশয়,

আমি আপনার প্রজা না হলেও আপনার স্বদেশবাসী । আমি লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন । আমাকে ওহাবী বলে আপনি মুসলমানদের নিকট হেয় করবার চেষ্টা করেছেন । আপনি কেন এ' রকম করছেন বুঝতে পারছি নে । আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নি । যদি কেহ আমার

বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলে আপনাকে উত্তেজিত করে থাকে, তাহলে আপনার উচিত ছিল, সত্যের অনুসন্ধান করে হুকুম জারি করা । আমি 'দ্বীন – ইসলাম' প্রচার করছি । মুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি । এতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে? যার ধর্ম সেই বুঝে । আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না । ওহাবী ধর্ম নামে পৃথিবীতে কোন ধর্ম নেই । আল্লাহর মনঃপূত ধর্মই ইসলাম । ইসলাম ধর্মের অর্থ হচ্ছে শান্তি । একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যাতিত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না । ইসলামী ধরণের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট রাখা, ঈদুল আজহার কোরবানী করা ও আকিকা কোরবানি করা, মুসলমানদের উপর আল্লাহর ও আল্লাহর রসুলের (সঃ) নির্দেশ । মসজিদ প্রস্তুত করে আল্লাহর উপাসনা করাও আল্লাহর হুকুম । আপনি ইসলাম – ধর্মের আদেশ, বিধিনিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না । আমি আশা করি আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করবেন ।

ফকত হাকির ও না-চিজ

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর"

(বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃষ্ঠা – ৪৫)

তিতুমীরের পত্র পেয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় রোষে উন্মত্ত হয়ে উঠেন এবং পত্রবাহক আমিনুল্লাহকে বন্দী করে রাখেন । বন্দী অবস্থায় আমিনুল্লাহর মৃত্যু হয় । ফলে জটিলতা আরও বেড়ে যায় । তিতুমীর চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে । তিনি

হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিদেশী শক্তিকে উচ্ছেদ করতে কিন্তু জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম বিদ্বেষের দরুন সব বানচাল হয়ে যায় ।

ঐতিহাসিক অমরদণ্ড লিখেছেন, "তিতুমীর প্রথম জীবনে ধনী হিন্দু গৃহে চাকরি করতেন । ....সরফরাজপুর গ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি সেখানে যান এবং জুম্মা নামাযের পর হিন্দু – মুসলমানকে সম্বোধন করে বলেন যে, কেবলমাত্র ধর্মের ব্যবধানের জন্য অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানের সঙ্গে বিরোধ আল্লাহর অপছন্দ এবং দুর্বল অমুসলমানকে সাহায্য করা মুসলমানদের কর্তব্য । সুবক্তা তিতুমীরের বক্তৃতা শোনার জন্য দলে দলে হিন্দু মুসলমান উপস্থিত থাকতেন – তিতুমীরের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, হিন্দু কৃষকদের সাথে নিয়ে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ করা । জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক হিন্দু কৃষকও তিতুমীরকে আশ্রয় করতেন । তিতুমীরের দল বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের অনুগামীদের দাড়ির উপর (মাথা পিছু আড়াই টাকা), মসজিদ নির্মানের জন্য অতিরিক্ত কর, পিতা – পিতামহ বা আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া নাম পরিবর্তন করে ও ওয়াহাবী মতে আরবী নামকরণের জন্য অতিরিক্ত কর ইত্যাদি জারি করেন । তিতুমীর তাঁর শিষ্য আমিনুল্লাহের মাধ্যমে জমিদারের কাছে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন । জমিদার আমিনুল্লাহকে গারদে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় । আমিনুল্লাহ তিতুমীর প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রথম শহীদ ।" (উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ, পৃষ্ঠা – ২৫)

তিতুমীর শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সরাসরি জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । দেশের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হিন্দু মসলমান সকলেই তিতুমীরের আহ্বানে সাড়া দেন । আব্দুল গফুর সিদ্দিকি লিখেছেন, “গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথা রায়, কলকাতার নামকরা জমিদার লাটু রায়, মোল্লা আটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেব প্রায় হাজার খানেক লাঠিয়াল ও সশস্ত্র বরকান্দাজ নিয়ে তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণ করলে দুপক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে । ডেভিস সাহেব কোনমতে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও দেবনাথ রায় হলেন নিহত ।” (শহীদ তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৭৯)

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তিতুমীরকে জব্দ করার জন্য ছোট লাটের নির্দেশ পেয়ে মিঃ আলেকজান্ডার বাদুড়িয়া গ্রামে আসেন । ফলে তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় কিন্তু মিঃ আলেকজান্ডার প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করেন । ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, “এদিকে দলে দলে হিন্দু মুসলমান চাষী মজুর তিতুর নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন । তাঁরা তিতুকে রাজা বলে স্বীকৃতিও দিলেন ।” (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা – ২২৭/২৭৯)

এম. মুনিরুজ্জামান লিখেছেন, “এবার তিতুমীর নীল চাষীর উপর জুলুমের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালেন । তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু আর মুসলমান রায়তরা এ উপলক্ষে সংঘবদ্ধ হলেন । অত্যাচারী জমিদারদের সঙ্গে নীলকররা হাত মেলালেন ।

তিতুমীরের শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিরা নানা সত্য – মিথ্য রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে বৃটিশ বিরোধী ও শান্তি ভঙ্গকারী রুপে চিহ্নিত করতে চাইলেন । বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার আলীপুরের জজ এবং জমিদার কৃষ্ণদেব রায় নাড়কেলবেড়িয়া এলেন সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে, সংঘর্ষ শুরু হল । সাহেব গুলি ছুঁড়বার নির্দেশ দিলেন কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধ শক্তি দেখে পিছু হটতে বাধ্য হলেন । এ সংঘর্ষে কেউ নিহত হননি ।

তিতুমীরের এই সাফল্য চব্বিশ পরগণা, যশোর ও নদীয়ার বিস্তৃত এলাকায় তাঁর প্রভাব সম্প্রসারিত হল । প্রতিক্রিয়াশীল কোন কোন শক্তি তিতুমীরের এই অগ্রগতিতে তাঁর বশ্যতা স্বীকারও করলেন । তিতুমীর পূর্ণ আজাদী (স্বাধীনতা) ঘোষণা করলেন ।” (উপমহাদেশের মুসলমান, খণ্ড – ১, পৃষ্ঠা – ৮৪)

তিতুমীরের এই বিরাট সাফল্য জমিদারদেরকে বিচলিত করে তোলে । লর্ড বেন্টিংকও বিচলিত হয়ে পড়লেন । জমিদার ও নীলকর সাহেবরা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয় । তিতুমীর বেশ কয়েকটি নীলকুঠী দখল করে নেন । জমিদার ও নীলকরদের হাতে ছিল গোলাগুলি ও আধুনিক অস্ত্র, তিতুমীরের মুজাহিদদের হাতে ছিল ইঁট, কাঁচাবেল, তরবারি, তীর, সড়কি, বল্লম, লাঠি । তবুও সংঘর্ষ শুরু হলে প্রতিপক্ষের সৈন্যরা মার খেলেন এবং পালাতে বাধ্য হলেন ।

তিতুমীরের বাহিনীতে ফকির বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মিশকিন শাহ যোগ দিলে তিতুমীরের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল । তিতুমীর মন্ত্রী পরিষদ গঠন করলে তিনি নিজে

হলেন খলিফা, প্রধানমন্ত্রী হলেন মুনশী ময়জুদ্দীন আর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হলেন মিশকিন শাহ । এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, “A highly developed organization to which then no parallel in the history of revolutionary movement against British .... the 19th Century.” (History of Freedom Movement. Page – 280/281)

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব তিতুমীর সহ্য করতে পারলেন না । রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মুসলিম বিদ্বেষ তিতুমীররের মুজাহিদ বাহিনী মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের উপর চড়াও হতে বাধ্য করেছিল । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ৩০০ অস্ত্রধারী মুজাহিদ বাহিনী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য রওনা হলেন । তাঁরা গ্রামের বারোয়ারি তলায় এসে তাঁরা গরু জবাই করেন । মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের প্রাঙ্গনে গরু জবাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে মুজাহিদ বাহিনীর উপর অস্ত্র চালান । ঘটনাস্থলেই কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হন । প্রতিশোধ নেবার জন্য মুজাহিদ বাহিনী মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করেন ।

বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে তিতুমীর চুড়ান্ত সফল হওয়াতে তিনি উৎসাহিত হন । একবার পুঁড়ায় দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে জমিদারের দেড়শ বাহিনী তিতুমীরকে গ্রেফতার করতে আসেন । মুজাহিদ বাহিনী বাধা দিলে জমিদার বাহিনীর সাথে তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে । এই ঘটনায় দারোগা নিহত হন এবং অনেক পাইক বরকান্দাজ হতাহত হন । সৈয়দ আহমদ শহীদ পেশোয়ারে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলে তিতুমীরও উৎসাহিত

হয়ে উঠেন এবং ঘোষণা করেন এ দেশে ইংরেজদের থাকার কোন অধিকার নেই । মুসলমানদের উৎখাত করে এদেশে ইংরেজ ক্ষমতা দখল করেছে তাই মুসলমান এ দেশের দাবিদার । মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদারের কাছ থেকে তিনি রাজস্ব দাবি করলেন । (উপমহাদেশের মুসলমান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা – ৮১, এম মুনিরুজ্জামান)

বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে সাফল্য লাভ করার পর তিতুমীরের বাহিনী যখন পুনর্গঠিত হল তখন সেই বাহিনীর কর্তৃত্বের ভার পড়ল তিতুমীরের ভাগনে সেখ গোলাম মাসুমের উপর ।

সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন বিরোধী জমিদার ও নীলকররা বসে থাকার পাত্র নয় । তারা আবার তাঁর উপর আঘাত হানতে পারে । তাই তিনি সুরক্ষার জন্য নারকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা নির্মান করলেন । এবং সেখানে হাতিয়ার হিসাবে রাখলেন তীর, বর্শা, লাঠি, ইঁট, পাথর ও কাঁচা বেল । বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, “কেল্লা বাঁশের হউক, ভরতপুরের মাটির কেল্লার মতন সুন্দর সুগঠিত সুরক্ষিত না হউক সে কেল্লার রচনাকৌশল দৃশ্যময় । কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছিল, কোন প্রকোষ্ঠে আহার্যদ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল । কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কি । বাঁশের ছোট লাঠি সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল, ... কোন প্রকোষ্ঠে স্তুপাকারে কাঁচাবেল ও ইষ্টখণ্ড (ভাঙ্গা ইট) সংগৃহীত হইয়াছিল । এই কেল্লার কৌশল কায়দা তিতুর বুদ্ধি ও শিল্প চাতুর্যের পরিচায়ক । তিতুমীর তাঁহার অনুচরবর্গের ধারণা হইয়াছিল এই কেল্লা বাঁশের হইলেও প্রস্তর নির্মিত দুর্গ অপেক্ষা দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য ।” (তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৭০)

তিতুমীরের এই বাঁশের কেল্লা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক অভিনব কৌশল ছিল । বাঁশের কেল্লার সম্পর্কে ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, “ইয়া এক অপূর্ব যুদ্ধ । অদ্ভুত এক বাঁশের কেল্লা । বর্বর মদমত্ত ইংরেজরা তিতুর অদ্ভুত সাহস আর আর রণ নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল । পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এর কোন তুলনা নাই ।” (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

দিনটা ছিল **১৮৩১** খ্রীষ্টাব্দের **১৪**ই নভেম্বর । কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী নারকেলবেড়িয়া গ্রামে এসে পৌঁছাল । কর্ণেল এসেছিলেন তিতুমীরকে গ্রেফতার করতে । কর্ণেল গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠ করে জানালেন যে তিতু আত্মসমর্পন কররে রাজি আছে কিনা । তিতুমীর জানিয়ে দিলেন যে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না । কর্ণেলের আদেশে গুলিবর্শন শুরু হল । মুজাহিদ বাহিনীও তীর ছুঁড়তে শুরু করল । শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ । কর্ণেল বাহিনীর কাছে হাতিয়া হিসাবে ছিল, তরবারী, বন্দুক, কামান প্রভৃতি অত্যাধানিক হাতিয়ার কিন্তু তিতুমীরের বাহিনীর কাছে ছিল তীর, বর্শা, লাঠি, ইঁট, পাথর ও কাঁচা বেল প্রভৃতি অনুন্নত হাতিয়ার । প্রথমে উভয় পক্ষের কোন ক্ষতি হয়নি । কর্ণেল কামানের ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়লেন কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর তীর বর্ষন চলতেই থাকল । তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন কামানের সামনে তাঁর সামান্য অস্ত্র কিছুতেই টিকতে পারবে না । তাই তিতুমীর, মাসুম আলী ও মিসকিন খাঁ মুজাহিদ সৈন্যদের বললেন – আমাদের কামান নেই, হয়ত মৃত্যু হতে পারে; যাতের ইচ্ছা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পার । কিন্তু এমন একটিও দুর্বল হৃদয় সেদিন পাওয়া গেল না, যে

প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত । যুদ্ধ আরম্ভ হতেই হুঙ্কার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করলো বিপ্লবী সৈন্য । ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম, কিন্তু কালবিলম্ব না করে বিরাট কামান গর্জে উঠল । কামান পরিচালককে হত্যা করার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে গিয়ে কামানের উপর দাঁড়ালেন । কিন্তু তার কয়েক সেকেন্ড পুর্বেই কামান দাগা হয়ে গিয়েছিল । অজস্র বিপ্লবী সৈন্য ইংরেজের কামানের গোলায় ছিন্ন – ভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোন ছিটিয়ে পড়ল । ওদিকে মাসুম তো একেবারে ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত । আর কয়েক সেকেন্ড আগে দিতে পারলে হয়তো কামান মাসুমের হাতেই এসে যেত । মাসুম বন্দী হলেন । (চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তাজা, পৃষ্ঠা – ২১৪)

কামানের গোলায় এবং আকাশে বাতাসে আগুন ঝরতে লাগল । বিষাক্ত বারুদের গন্ধে দিগন্ত জুড়ে ধুমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল । সেই সময় তিতুমীর নামায পড়ছিলেন । কামানের গোলায় তিতুমীরের ডান হাতের হাড় ভেঙ্গে চুর্ণ – বিচুর্ণ হয়ে গেল । তিতুমীর বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন । এই চরম যুদ্ধে বাংলার বীর নায়কের জীবন অবসান হয় ।

যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ইংরেজ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদের শুরু হয় বিচারের নামে প্রহসন । সেনাপতি গোলাম মাসুমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয় । বিহারী লাল সরকার লিখেছেন, “বন্দীদিগের বিচার আলীপুরে হইয়াছিল । সর্বমোট তিনশত বন্দীর মধ্যে একশত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হইয়াছিল । সেনাপতি সেখ গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল ।” (তিতুমীর, পৃষ্ঠা – ৭০)

O. Kinealy লিখেছেন, "আলীপুরের জজ ও কালেক্টর বন্দীদিগকে লইয়া নাড়কেলবেড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন । সে স্থানে তিতুমীরের আড্ডার সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গনে এক সভা হইয়াছিল..........। বিচারে সেখ গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড, কতকগুলি লোকের দ্বীপান্তর এবং কতকগুলি লোকের কারাদণ্ড হইয়াছিল । মাসুমের ফাঁসি তিতুর আড্ডার সম্মুখস্থিত ময়দানেই হইয়াছিল । সর্বমোট বন্দীর সংখ্যা ছিল আট শত ।" (The Wahabis in India. উদ্ধৃতি এম আব্দুর রহমান, শহীদ বীর তিতুমীর, তথ্যসূত্র উপমহাদেশের মুসলমান, পৃষ্ঠা – ১১৪)

যাইহোক, ৮০০ জন বন্দীর মধ্যে ৩০০ জনের বিচার হয় এবং বিচারে ১২৫ জনের ২ – ৭ বছর ও ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অনেকের দ্বীপান্তর হয় । অভিযুক্তদের মধ্যে সাজন শাহ ছিলেন একজন । মিসকিন শাহ অন্তর্ধান হয়ে যান ।

তিতুমীরের মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ হুগলী গ্রামের লোকেরা সমাধিস্ত করে বলে জানা যায় । অনেকের ধারণা মিঃ আলেকজান্ডার তিতুমীরের লাশকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন যাতে শহীদের স্মৃতি স্তম্ভ না রচিত হয় এবং তিতুর মুজাহিদ অনুগামীরা যাতে পুনরায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হয় । কিন্তু প্রকৃত শহীদের মৃত্যু কোথায় । আল্লাহ বলেছেন, "ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতুলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত" অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাঁদেরকে মৃত বল না, বরং তাঁরা জীবিত । কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না ।

সুতরাং তিতুমীর জীবিত আছেন বাংলার মানুষের অন্তরে । জীবিত থাকবেন চিরকাল ।

তিতুমীরের আন্দোলনের পর্যালোচনা

তিতুমীরের আন্দোলন ছিল বাংলায় ব্রিটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদী (ওহাবী) আন্দোলন । তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট অনুপ্রাণিত হয়েই এই আন্দোলনে নেমেছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আন্দোলনলে অনেকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে দেখেছেন এবং এটাকে হিন্দু – মুসলমানের লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । কিন্তু কোনভাবেই তিতুমীরের এই গণআন্দোলন সাম্প্রদায়িক ছিল না । হিন্দুরা এই আন্দোলনকে সমর্থন না করলে তিতুমীরের পক্ষে এই আন্দোলনের বিস্তার লাভ করা সম্ভব হত না । জমিদার, উচ্চশ্রেণীর এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর হিন্দুরা তিতুমীরের বিরুদ্ধে অবস্থান করলেও খেটে খাওয়া কৃষক শ্রেণীর হিন্দুরা চিরকাল তিতুমীরকে সমর্থন জানিয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই হিন্দু জনগণের বিরুদ্ধে রুপান্তরিত হলেও নির্যাতিত ও শোষিত হিন্দুরা জমিদার ও নীলকরদের শোষনের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সেজন্যই তিতুমীরের আন্দোলন ক্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই এক রাজনৈতিক গণআন্দোলনে রুপান্তরিত হয়েছিল ।

তিতুমীরের অনুগামী মুজাহিদরা প্রথমে কিছু হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ৩০০ অস্ত্রধারী মুজাহিদ বাহিনী মুসলিম

বিদ্বেষী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য রওনা হলেন । তাঁরা গ্রামের বারোয়ারি তলায় এসে তাঁরা গরু জবাই করেন । মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের প্রাঙ্গনে গরু জবাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে মুজাহিদ বাহিনীর উপর অস্ত্র চালান । ঘটনাস্থলেই কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হন । প্রতিশোধ নেবার জন্য মুজাহিদ বাহিনী মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করেন । আর এসবের জন্য দায়ী ছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী জমিদার কৃষ্ণদেব রায় । কৃষ্ণদেব রায় অবৈধভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিনিষের উপর হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মুসলমানদের দাড়ির উপর, মুসলিম নামকরণের উপর কর চাপিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন । সেজন্যই মুজাহিদ বাহিনী কিছু হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপ করেছিলেন । যদিও তা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক ছিল না । কিন্তু জমিদারের অতি মুসলিম বিদ্বেষের জন্যই মুজাহিদদেরকে এটা করতে বাধ্য করেছিল ।

এটা ভুললে চলবে না যে, সব মুসলমানও তিতুমীরকে ভাল চোখে দেখতেন না । মুসলমা জমিদাররা তো আছেনই সেই সাথে তিতুমীরের মতাদর্শের বিরোধী মুসলমানরাও তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতেন । বিদআতপন্থী কবরপূজারী মুসলমানরা তিতুমীরকে ‘ওহাবী’ বলে গালিগালাজ করত । রক্ষণশীল মুসলমানরাও তিতুমীরের প্রভাব খর্ব করার জন্য হিন্দু জমিদারের শরণাপন্ন হয় সেজন্য উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি তিতুমীর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না । তাই দেখা যায় যখন তিতুমীরের বাহিনী পুঁড়া আক্রমণ করেন তখন তাঁরা বেছে বেছে শুধু হিন্দুদের বাড়িই আক্রমণ করেন নি অনেক মুসলমানের বাড়িও আক্রমণ করেছিলেন । এইসব মুসলমান তারাই ছিল যারা তিতুমীরের দলে যোগ দেয়নি । তিতুমীর শেরপুরে ইয়ার মুহাম্মাদ নামে একজন সম্ভ্রান্ত

মুসলমানের বাড়িও লুঠ করেন । তাই বলা যায় তিতুমীরের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল না । এই সংগ্রাম ছিল শোষিত জনগণের পক্ষে শাষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ।

তিতুমীর যে শাষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন এই ব্যাপারটিকে স্মিথ শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন । তিনি লিখেছেন, "The struggle was a pure class struggle, and the communalist confusion of the issue evaporated. The Movement made use of a religion's ideology, as class struggles in Pre-industrialistic society have often done, but thought religious it was not communalist." স্মিথ আরও লিখেছেন, "The mutiny, like political Jihads of the "Wahabis' emphasizes the Muslim Community of India as a religio-political unit; but at the sametime emphasized cooperation between that community and the Hindus in face of a common enemy." অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একত্রে মিলে শত্রুর মুকাবিলা করেছে । উভয় সম্প্রদায়ের শত্রু হল ইংরেজ রাজশক্তি । তাই স্মিথ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "They proclaimed anJihad against the infidel, and appealed not only to the oppressed to unite against their exploiters, but to the muslims to unite for the defence of their religion. Non of these political activities, however, was anti-Hindu." (Modern Islam in India, 2nt edition, London, 1945, Page – 192)

হিন্দুরা তিতুমীরকে সমর্থন করেছিল বলেই কয়েকজন হিন্দুকে আটক করেছিল । বহু হিন্দু ওহাবীদের সংগ্রামী তহবিলে অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলেও জানা যায় । বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, "তিতু আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল, সে ধর্ম্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না । লোকে তাহার বাগ – বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু প্রথমে শোনিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করিতে চাহে নাই । জমিদার কৃষ্ণদেবের জরিমানায় ব্যবস্থায় তাহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিলেন ।" (তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই, পৃষ্ঠা – ৪৭)

সাজন গাজীর গানের সংকলনের ভূমিকায় লেখা আছে, "তিতুমীর ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি ছিলেন । এই কারণে তিনি মক্কা যান এবং সেখানে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন । ব্রিটিশ ভারতের প্রথম যুগে ব্রিটেন মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের শাসনবভার কেড়ে নেওয়ায় সাধারণ মুসলমান তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেন তা নিয়ে বর্তমানকালে অনেক ধরণের গবেষণা হয়েছে । তবে সকলেই স্বীকার করেছেন যে, এই সকল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ বিরোধিতা ও ব্রিটিশের সমর্থক হিন্দু জমিদারেরও বিরোধিতা করা ।......... তিতুমীরের ওপর সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের প্রভাব ছিল, কিন্তু তিতুমীর কখনও সাধারণ হিন্দু কৃষকদের বিরুদ্ধে ছিলেন না । জমিদারের নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক হিন্দুও তাঁর দলে যোগদান করেন এবং তাঁরা তিতুমীরের বক্তৃতা থেকে জেনেছিলেন যে – তিতুমীর মনে করতেন হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের

অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব । নীলকর শুধু ইউরোপীয়রা ছিলেন না, অনেক হিন্দু জমিদারও নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন ।" (সাজনের গানে তিতুমীরের লড়াই, পৃষ্ঠা – ৮)

সুতরাং তিতুমীরের লড়াই সেইসব হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল যারা ব্রিটিশদের বন্ধু ও কৃষকদের শত্রু ছিল । সাধারণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই কোনদিনই ছিল না । গিরীন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন, "এক শ্রেণীর মানুষ ব্রিটিশ রাজশক্তির আশ্রয়ে কৃষক জনসাধারণের ওপর যেভাবে শাসন, জীবিকার ওপর হস্তক্ষেপ, রুজি – রোজগারের সিংভাগ ছিনতাই করতো তারা স্থানীয় জমিদার । কামার, কৃষক, কুমার, তাঁতী, পটুয়া মৎসজীবি প্রভৃতি হিন্দু – মুসলিম প্রজাগণের উপর সেই জমিদারগণ তাঁদের নায়েব, গোমস্তা, পাইক, গুণ্ডা, লাঠিয়াল প্রভৃতির সাহায্যে খাজনা আদায়ে সর্বস্ব হরণ করে আসছিল । প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞ কৃষক তিতুমীর সেই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইলেন । ....ইসলামী আদর্শে শান্তি – সাম্য – সৌভ্রাতৃত্বভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সকলকে সামিল হতে তিতুমীর আহ্বান জানালেন ।" (সাজনের গানে তিতুমীরের লড়াই, পৃষ্ঠা – ২১)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় লিখেছেন, "তখন হিন্দু ও মুসলমান বিশেষ করে উভয় সম্প্রদায়ের নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহী তিতুমীরের পতাকা তলে এসে সমবেত হন । এই বিদ্রোহই ইতিহাসে বারাসাতের অভ্যুত্থান হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে (১৮৩১, ১৭ নভেম্বর) আজও বাংলার লোকগাথা ও লোক সংগীতের মধ্যে একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদ হিসাবে তিতুমীরকে স্মরণ করা হয় ।" (ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান, পৃষ্ঠা – ১৭)

তাই তিতুমীরের এই আন্দোলনকে কোনদিনই সাম্প্রদায়িক এবং হিন্দুবিরোধী বলা যেতে পারে না । এটা ছিল নির্যাতিত ও নিপীড়িত কৃষকদের পক্ষে জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক গণআন্দোলন ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) (অফলাইন/অফলাইন) ৬০/-

৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত
তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের
অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) --

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ---

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ---

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ---

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ---

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ---

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ---

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ---

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ---
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ---
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ---
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ---
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ---
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ---
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/-
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর
মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) 'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-

৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব
(প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক
ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধে
আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০/-
৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে
রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-
৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-
৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-
৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-
৫৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান [অনলাইন] ১৫০/-
৫৬) শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর রাজনৈতিক অভিযান [অনলাইন] ৪০/-
৫৭) দিল্লীর মসনদে তালিবান (অফলাইন) ৮০/-
৫৮) আফজল গুরুর ফাঁসি একটি জুডিশিয়াল হত্যাকান্ড (অনলাইন) ২৫/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ
হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ---
২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ---
৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ।
(মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-
৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ- ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়]